

ଅଞ୍ଜଳି



ANJALI 2013: DURGA PUJA MAGAZINE



Anubhab Das (10 years) - left and right



Roshni Ray (12 years)



Message from the Board

Dear Friends:

For last six years, the greater Binghamton Bengali community has been organizing Durga Puja celebration. It is encouraging to note that the celebration is gathering momentum every year with the support from our communities in Binghamton and nearby towns in NY and PA. With generous support from our members, we have been inspired to move forward with this event on a sustainable and growing path.

We thank all the volunteers for their involvement in planning and execution of this event. We keenly look forward to your participation in 2013 Durga Puja celebration on October 5 and 6. The event is enhanced with a variety of cultural programs. The Greater Binghamton Bengali Community Durga Puja committee invites you to share the joy and happiness of this festive time and offers warm 'Sharodiya' greetings to all of you and your family.

Sincerely

*2013 Durga Puja Committee
Greater Binghamton Bengali Association
<http://www.binghamtonpuja.org/>*



আমাদের পূজো

উৎপল রায়চৌধুরী

আকাশ বাতাসে একটুখানি হিমের ছোঁয়া।
গরমের ছুটির দিনগুলো কেমন করে যে
হারিয়ে গেছে, তার হিসেব মেলানো কঠিন।
তবে তাই নিয়ে মন খারাপ করবার কিছু
নেই। কবিগুরুর ‘এসেছে শরৎ, হিমের
পরশ...’ আমরা সবাই ছোটবেলায় কোনও না
কোনও সময় পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে ভেসে
উঠেছে পূজোর ছবি। নীল আকাশে পেঁজা
তুলোর মত মেঘ, কাশফুল, ঢাকের বাজনা,
নতুন জামা কাপড় আর পূজো মন্ডপে
কচিকাঁচার মিলে হল্লোড়। এই অনুভূতি গুলো
আমাদের বঙ্গীয় সঙ্গার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে
জড়িয়ে আছে, সে আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই
ছড়িয়ে থাকি না কেন। বৃহত্তর বিংহ্যামটন
বলতে আমাদের পরিভাষায় নিউইয়র্ক এর
দক্ষিণ অংশ আর পেন্সিলভেনিয়ার একেবারে
উত্তরটুকু মিলিয়ে আমরা এখানে ত্রিশ চল্লিশটি
প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবার। অক্টোবর মাসের
অনেক আগে থেকেই আমাদের মনও একই
ভাবে আনচান করে ওঠে। প্রস্তুতি নিতে শুরু
করি আমরা মা দুর্গাকে আরও একবার বরণ
করবার।

আমাদের পূজো এবারে ষষ্ঠ বছরে পা
রাখলো। পরিবর্তন আর বিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর
ধর্ম। আমরাও তার বাইরে নই। আমাদের
এবারকার পূজোতে কিছু কিছু জিনিষ একটু
অন্যভাবে করা হবে সেটা শুরুতেই আমরা
ভেবে নিয়েছিলাম। যে ব্যাপারটাতে সব চাইতে

বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো, তা হোলো যে
আমাদের পূজোর যদি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি চাই
আমরা, তাহলে আমাদের সদস্য সংখ্যা
বাড়াতেই হবে। তার জন্যে আমাদের অনুষ্ঠান
সূচির কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন, যাতে
আমাদের পূজোটা অবাংলাভাষীদের জন্যেও
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেটুকু মনে রেখে
আমরা পূজোর আচরণবিধিতে কিছু না
পালটালেও খাওয়াদাওয়া এবং বিনোদন, এই
দুটো ব্যাপারেই একটু নতুনত্বের ছোঁয়ার প্রচেষ্টা
করেছি। তবে তার আগে বলতে হবে যে
এবারই প্রথম আমাদের পূজোর আনন্দোৎসব
দুদিন ধরে করবার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
আমাদের কার্যসূচীর প্রথম দিন সকাল বেলা
শাস্ত্রীয় বিধি মেনে পূজো, দুপুর বেলায় এবং
রাতে নিরিমিশ খাওয়া, বিকেলে কচিকাঁচাদের
নাটক ‘মহিষাসুর-মর্দিনী’, সন্ধ্যারাতে নিমন্ত্রিত
অতিথি শিল্পীদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং রাত্তিরে
নিমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীর হিন্দি ছায়াছবির ও
অন্যান্য আসর জমানো গান। এ অঞ্চলে
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে অনেক
লোক আছেন। আমরা চাই ওঁরা সবাই
আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করে সেটিকে
আরও সাফল্যমন্ডিত করে তুলুন। সেই
চিন্তাধারারই প্রতিফলন এই পরিবর্তিত
অনুষ্ঠানসূচী। পরের দিন অবশ্য নির্ভেজাল
বাংলা ব্যাপার। আমাদের দিন শুরু একটি
‘শ্রুতি নাটক’ দিয়ে। শ্রীমতী রুবি বিশ্বাসের
পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষের

কবিতা' রূপায়ন করবেন কোর্টল্যান্ড, ইথাকা আর সিরাকিউসের স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ। তারপর পাঁঠার মাংসের সঙ্গে এক জমাটি মধ্যান্যভোজন। খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হলে স্থানীয় শিল্পীদের একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান এবং নিমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীর মন ভরানো বাংলা গান। সবশেষে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা এবং আবার প্রতীক্ষার শুরু আগামী বছরে মাকে আবাহন করবার।

ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে আমাদের এই পূজোর আবেদন অনেকখানি গভীর। এদেশে সবাইকে সব সময় নিজেদের কাজে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। তার মধ্যেও অনেকেই

যে সময় করে নানা ভাবে চেষ্টা করে যায় অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবার জন্যে, আমার কাছে তার মূল্য অপরিসীম। পরিকল্পনা পর্যায়ের মাঝে মাঝেই অনেকের সাথে আমাদের দেখা হয়, কথা হয়, যোগাযোগের সুত্রটা আরও একটুখানি গভীর হয়, সেটুকুই বা কম কিসে। আশা করবো আগামী বছরগুলোতে মা আসবেন আবার আমাদের কাছে তাঁর মহিমাময়ী রূপে দশদিক উজ্জ্বল করে। গত পূজোগুলোর কয়েকটা ছবির মাধ্যমে স্মৃতি চারণার সাথে সাথে এবারকার মতো এইটুকুই চাইবো যে আমরা যেন আগামীদিনেও তাঁকে সার্থক ভাবে আহ্বান করে উঠতে সক্ষম হই।







বিদেশে আগমনী সুর

ভাস্বতী বিশ্বাস

শরৎ এসেছে নীল গগনে,
সাদা মেঘের ভেলা।
মেপল পাতায় রঙ ধরেছে
লাল কমলা-হলুদের মেলা।।
সবুজ ঘাস ঢেকেছে শিশিরে,
স্নিগ্ধ হিমেল ছেঁয়ায়।
চারিদিকে নাচে ক্রিসাঙ্ঘিমাম,
আশ্বিনের শীতল দোলায়।।
শারদীয়ার ওই আগমনী সুর,
বাঙ্গালীর ঘরে বাজে।

মা এসেছেন বিংহ্যামটনে,
দুর্গতিনাশিনী সাজে।।
সবাই মাতুক হাসি-হিল্লোলে,
প্রাঙ্গণে বাজুক ঢাক কাঁসরের খেলা।
অর্ঘ্যে, গন্ধে, শঙ্খধ্বনিতে,
আনন্দে কাটুক স্বর্ণালী রৌদ্রবেলা।।
অঞ্জলি দিয়ে জগৎজননীকে,
এসো মোরা করি প্রার্থনা।
আলোকের সুধা বরিষণে যেন,
মুছে যাক ভুবনের গ্লানি যন্ত্রণা।।





By Aditya Banerjee
Durga Pooja, Binghamton 2013



By Ananta Banerjee
Durga Pooja, Binghamton 2013



সম্পাদকীয় মণ্ডলীর পক্ষ থেকে

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

দুর্গাপূজা বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি দিয়াসপোরা (*Diaspora*) আছেন, সেখানেই দুর্গাপূজা দেখা যায়। বাঙালির, ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিকতা; সবকিছু মিলেমিশে আছে তার দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে। এই দিনকয়টির জন্য থাকে সারা বছরের অপেক্ষা। দুর্গাপূজার সবচেয়ে বড় আবেদন এই যে এই পূজা সকলের জন্য, অর্থাৎ সার্বজনীন। এই পূজা জনসাধারণের অর্থে, জনসাধারণের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। সর্বসাধারণের অংশগ্রহণেই এর সার্থকতা। সব কটি পূজাই সম্পন্ন হয় অসীম নিষ্ঠা, আবেগ আর ভালবাসার সঙ্গে।

সময়ের সঙ্গে দুর্গা পূজারও বিবর্তন ঘটেছে। দুর্গাপূজার উৎপত্তি হিন্দুধর্ম থেকে হলেও, বর্তমানে এই পূজার উদযাপনে শিল্প, সংস্কৃতি, এবং সৌন্দর্য্যবোধই বেশি প্রাধান্য পায়---হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় বিশেষ দেখা যায়না। সকল ধর্মের মানুষকেই পূজায় যোগ দিতে দেখা যায়। প্রতিমা ও পূজা প্যান্ডেলেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে; মূর্তি-শিল্পের উৎপত্তি হিন্দু ও বাঙালি সংস্কৃতি থেকে হলেও মূর্তি নির্মাণের বিবর্তন এখন শিল্প ও কৃষ্টির পথে এগিয়ে গেছে; ধর্ম ও জাতিগত সংস্কারে আবদ্ধ থাকেনি।

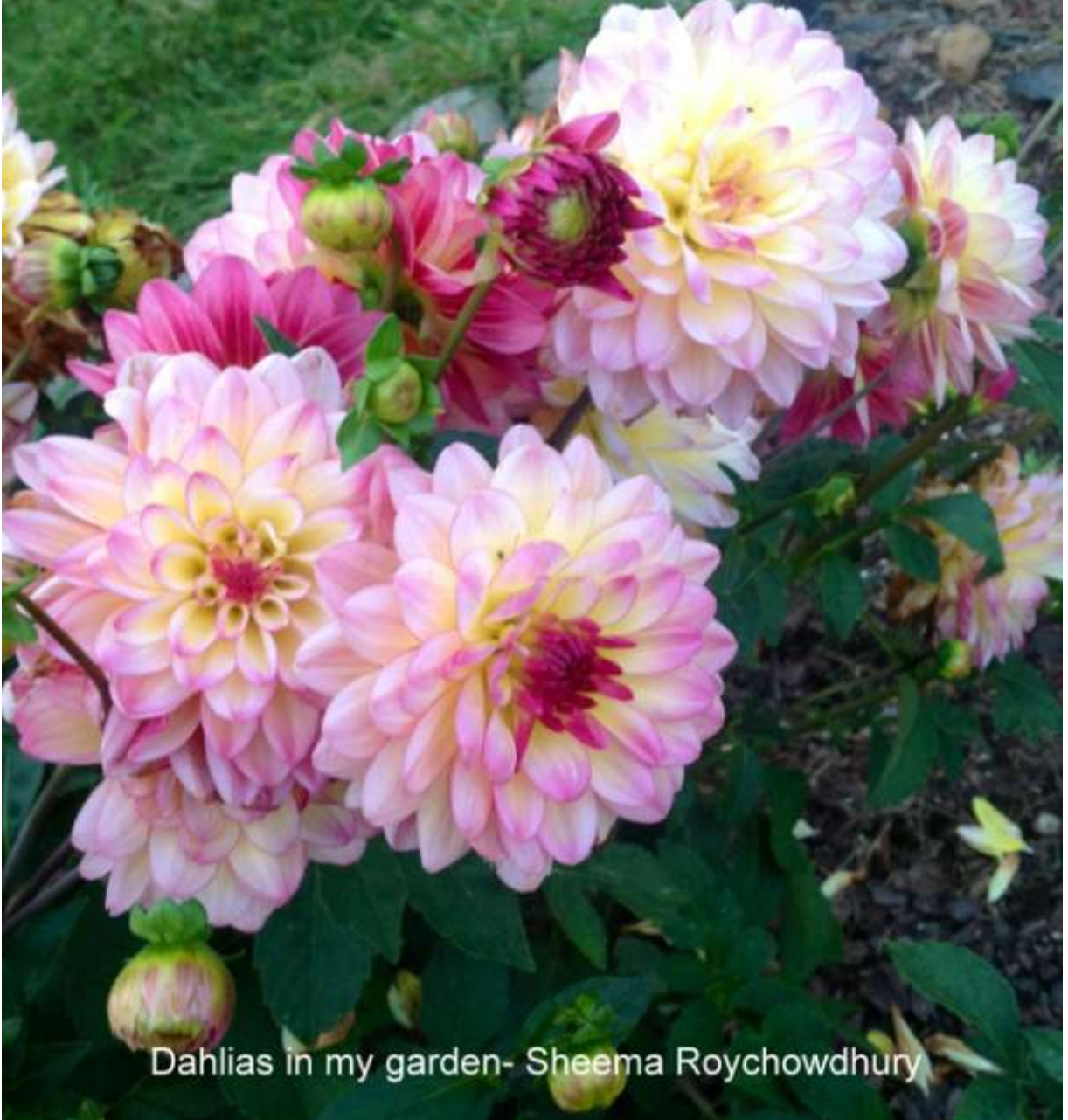
কলকাতা শহরে দেখা যায় মুসলমান, খ্রিস্টান, ও শিখ সকল সম্প্রদায়ের মানুষজন মুক্ত হাতে পূজা ফান্ডে অর্থ সাহায্য করে থাকেন আর আনন্দের সঙ্গে যোগদান করেন পূজার অনুষ্ঠানে।

আজকের প্রতিমা আর পূজা প্যান্ডেল গঠনের মধ্যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এবং অসাধারণ শিল্পকর্মের নিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় জনসাধারণকে তাদের পরিবেশ, ও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টা। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাষ্ট্র, এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সেখানকার প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার প্রয়াস ও দেখা যায়। যেমন, কেউ কেউ প্যান্ডেল তৈরি করেন সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা নানা মন্দিরের প্রতিক্রম দিয়ে। কোন পূজাতে হয়ত প্রতিমা গুলি আদিবাসীদের অনুকরণে তৈরি হয়, আদিবাসীদের সমস্যা প্রচারের জন্য, আরেকটি পূজাতে আবার দেখা যেতে পারে যে ইনকা সভ্যতার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করবার জন্য প্রতিমারা সব ইনকা-জাতের ছাঁচে তৈরি। অন্য কোথাও হয়ত মহিসাসুরের মুখ তৈরি হয় ওসামা বিন লাদিনের আদলে, জুরাসিক পার্কের অনুকরণে তৈরি হয় পূজা প্যান্ডেল। দিল্লীর লোটাস মন্দির, আর হোয়াইট হাউজের অনুকরণে তৈরি পূজা প্যান্ড্যালও দেখতে পাওয়া যায়। অশ্বর ফোর্টের মতো করে প্যান্ডেল গড়ে জয়পুর সহরের মূল আকর্ষণ গুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়ে থাকে।

কোনও প্যান্ড্যাল ও প্রতিমা তুলে ধরে জার্মান শিল্পীর কাজ; ইন্দো-জার্মান মিশ্রণের শিল্প; এই সর্বাধুনিক শিল্পের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত ধারণা দেখাবার চেষ্টা শিল্পিক সৃজনশীলতার প্রশংসায়োগ্য উদাহরণ বলা

যেতে পারে। বৈদ্যুতিক তার দিয়ে তৈরি প্রতিমা
এবং প্যান্ডেলও দেখা যায় বানান হয়েছে মানুষের
মনকে উল্লত করে মন থেকে হিংসা, দ্বেষ জাতিয়
অনুভূতি দূর করবার আশায়।

আমরাও সকলে আসুন এই পূজাতে মায়ের কাছে
প্রার্থনা করি যেন এই জগত থেকে হিংসা, দ্বেষ,
দুর্নীতি বিদায় নেয়, আমরা সকলে মিলে মিশে
আনন্দে জীবন কাটাতে পারি, আর সব মানুষ যেন
এই পৃথিবীতে সমান মর্যাদায় বাস করতে পারে।



আত্মযোগাৎ বা ঈশ্বর অনুভূতি কি এবং কখন হয়

অমল শাস্ত্রী, নিউইয়র্ক

অর্জুনও স্মরণাগতির স্থিতিতেই বিশ্বরূপের অনুভূতি করেছিলেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ যোগের ৪৭ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, “রূপং, পরং দর্শিতম্, আত্মযোগাৎ”।

“হে অর্জুন, আত্মযোগের দ্বারা, আমার পরম রূপের, অরূপ রূপ তুমি অনুভূতি করেছো”।

আত্মযোগ কি এবং কখন কার হয়?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যোগের বর্ণনা করেছেন। তাহলে আত্মযোগ অবস্থা এবং স্থিতি কি করে হয়?

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি যখন চরম ও পরম শিখর-ভূমিতে আরোহণ করে, সেই অবস্থায় ভগবৎ ভক্তের স্বদেহ ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং সেই সময়ে ভক্তের এই জগতের দেহ, মন, বুদ্ধি, বিচার এবং অহংকার ইত্যাদি লুপ্ত হয়ে একাকার বা একাত্মার স্থিতির সৃষ্টি হয়। এর অন্য অর্থ, ভক্তের স্বদেহ বোধ লুপ্ত হয়ে, শূন্যাবস্থায় স্থিতি নির্মিত হয়। ঈশ্বর প্রেমের পরাকার্যই হল ভক্তের বিলীনীকরণ বা বিলুপ্তিকরণ। এই প্রকার অবস্থাতেই ভক্ত বিশ্বরূপের অপরূপ অনুভূতি করে। এক কথায় বলা যায়, ভক্ত নিজেকে হারিয়ে ভগবানের হয়ে যায়।

আত্মযোগাৎ শব্দের অর্থ, “ঈশ্বরীয় যোগবল প্রভাবের দ্বারা অথবা যোগবল দ্বারা আত্মযোগাৎ স্থিতির উৎপত্তি হয়”।

ভগবানের সঙ্গে আত্মযোগ কার এবং কখন হয়?

যে ভক্ত বা সাধক সদাসর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত হয়ে, ঈশ্বরীয় কার্যতে আত্মশক্তি বা আত্মার উপযোগ বা ব্যবহার করে, সেই ভক্তের প্রতি সময়, প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে ‘আত্মযোগাৎ’ স্থিতির নির্মাণ হয়।

‘তত্-স্বম্-অসি’ - তত্ মানে পরমাত্মা আর স্বম্ মানে তুমি। তুমি ও পরমাত্মা, এই দ্বয়ের স্থিতি, একীভূত বা একরূপ স্থিতিতে পরিণত হলে, আত্মযোগাৎ স্থিতি অতি সহজেই সৃষ্টি হয়।

জগতের জীবকে “জীবাত্মা” বলা হয়। সেই জীবাত্মা আত্মযোগের দ্বারা, প্রত্যগাত্মা রূপে রূপান্তরিত হয় এবং পরমাত্মার সাথে সূক্ষ্ম রূপে যুক্ত হয়। এই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম স্থিতি জগতের প্রত্যেক জীবাত্মার বা ভগবৎ ভক্তের কিছুক্ষনের জন্য, অর্থাৎ এক সেকেন্ডের বা এক মুহূর্তের জন্য, ভগবানের সঙ্গে বা পরমাত্মার সঙ্গে একরূপ বা একাকার স্থিতি লাভ হয়। “যেখানে আমি, সেখানে ভগবান নেই, যেখানে ভগবান, সেখানে আমি

নেই”। “আমি”র অর্থ দুটো। এক, আমি নিজে, দেহ, মন, বুদ্ধি। দ্বিতীয়, “আমি”, আমার অহঙ্কার। এই স্থিতি প্রাপ্তির জন্য কোনোও বিশেষ প্রকার বা কোনোও প্রকার কঠিন সাধনার প্রয়োজন হয় না। ভগবান অতি সহজ, সরল এবং সুন্দর। সেই সুন্দরকে পেতে হলে আমাদেরও অতি সুন্দর হতে হবে।

তবে একথাও ঠিক, কেবল মাত্র আমার ইচ্ছাপূর্তির দৈবিক স্থিতি কোনোদিনই নির্মাণ হতে পারে না। প্রয়োজন হয়। এর অন্য অর্থ হল - “দিব্য-ঈশ্বরীয়। ভক্তের, এই জগতের দেহ, মন, বুদ্ধি, বিচারের এবং অহঙ্কার ভস্মীভূত হবার পরই আত্মযোগের উৎপত্তি শুরু হয়।

ঈশ্বরীয় দিব্য-জ্যোতির্ময় ধারাতে, ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া দিব্যতার প্রবেশ হওয়ার পরই, ঈশ্বরের সঙ্গে একরূপ অবস্থা প্রতিভাত হয়। এই স্থিতির নির্মাণই হল প্রানের প্রকৃত নির্মাণ।

এই জগতের প্রাণ, বহিমুখ। মানসিক বৃত্তি শ্বাসবায়ু, ঋণিকের (এক মুহূর্তের জন্য) রুদ্ধ হবার পর দৈবিক স্থিতি উপলব্ধি হয়। এই স্থিতি কোনো দিব্যজ্যোতির আলো বা অন্ধকার প্রকাশের উর্ধ্ব যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দৈবিক প্রেরণার সেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জীবাশ্মার অন্তরতম প্রদেশে, আত্মযোগাৎ স্থিতি নির্মাণ করে। সেই সময় পিঙ্গলা সুসুম্নার ভিতর প্রাণের প্রবেশ হয়।

যোগাভ্যাস বা ধ্যানযোগ দ্বারা ঈশ্বরীয় দিব্যজ্যোতির অনুভূতির ফলস্বরূপ, জগতের প্রত্যেক জীবাশ্মা, প্রত্যাগাশ্মা রূপে প্রবেশ

করে। এই সময়ে ভক্তের হৃদয়ে, বিশ্বের সর্ববস্তু, জ্যোতি স্ফুলিঙ্গ রূপের অনুভূতি হয়।

যোগ সাধনার প্রথম অবস্থাতে, প্রত্যেক জীব নাম কিম্বা শব্দ রূপে ভগবৎ দর্শন করে। অর্থাৎ জাগতিক ক্রিয়ার স্থিতিতে ঈশ্বর রূপ দর্শন করে। এই অবস্থাকে জাগ্রত অবস্থা বা living condition বলা হয়। সাধনার উর্ধ্বগতি লাভ করার পর, পরাবস্থার স্থিতি জ্যোতিঃ এবং জ্যোতির্ময় সত্ত্বা ছাড়া তখন অন্য কিছুই ভাব থাকে না।

যজ্ঞে বা হোম কুণ্ডে, ধাতু, বাস্তু, ঘি ইত্যাদির আছতি অগ্নিময় বা অগ্নিবৎ রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ হোমকুণ্ডে ঘি এবং কাঠ জাতীয় বস্তু, অগ্নির স্বরূপে পরিবর্তিত হয়।

ঠিক একই প্রকার ধাতু, কাঠ, ঘি ইত্যাদির ন্যায় জীবাশ্মা সেই অগ্নিবৎ স্থিতিতে কিছুকাল বর্তমান থাকে। ঈশ্বর রূপ উপলব্ধির পর পরমাশ্মার, পরম জ্যোতির্ময় জ্যোতিঃ ধারাতে, জীবাশ্মা এবং পরমাশ্মা এক রূপে আত্মযোগাৎ স্থিতিতে অবস্থান করে। ‘চিত্তে, প্রতিষ্ঠায় গোবিন্দ’, রূপে জীবাশ্মা, পরমাশ্মা গোবিন্দের সাথে আত্মযোগে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যময়-ভরা এক অরূপময় জগতের নির্মাণ হয়।

ভাগবতের কথাঃ

উদ্ধবজী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেবক এবং ভক্ত। তাই আমরা “উদ্ধব-গীতা” ও পেয়েছি। উদ্ধবজী ভগবানের অতি নিকটে। তাই উদ্ধবজীর মনে অহঙ্কার, “আমি একাই সবচেয়ে বেশী ভগবানকে ভালোবাসি”।

ভগবান অন্তর্মামী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবজীকে বললেন, “দেখ উদ্ধব, বহুদিন হয়ে গেছে আমি বৃন্দাবন ত্যাগ করেছি। গোপবাসীরা আমাকে অত্যন্ত মায়া-মমতা, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছে। তাদের খবর তুমি একবার নিয়ে এসো”।

উদ্ধবজী, গোপীদের কি প্রকার ভালোবাসা ভগবানকে ভালবাসত, তা জানবার কৌতূহল। ভগবানের বাণী শিরোধার্য করে উদ্ধবজী রথারোহণ করলেন। উদ্ধবজীর রথ বৃন্দাবনের সীমানাতে পৌঁছল। রথ থেকে নেমে উদ্ধবজী দেখতে পেলেন, “এক জলের ধারা নদীর মতন বয়ে চলেছে”। উনি এক গোপ বালককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “এই জলধারা কিসের”? গোপ বালক জবাব দিল, “হে মহান আত্মা, যেদিন থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন, সেইদিন থেকে প্রত্যেক গোপ-গোপীকা, ভগবানের জন্য অবিরত ক্রন্দন করছেন। ওই অশ্রু ধারাই, এই নদীরূপে বয়ে চলেছে”।

এই কথা শোনবার পর উদ্ধবজীর মনের সমস্ত অহঙ্কার লুপ্ত হল।

ভগবানকে পূজা বা ভক্তি কি দিয়ে করতে হয়?

“পত্রম্-পুষ্পম্-ফলম্ এবং তোয়ং”। এখানে পত্র বা পাতার মানে এই দেহ পাতার স্বরূপ। পুষ্পম্ হল - জগতের, মনের যত কামনা-বাসনা। আর তোয়ং মানে জল। জল - গঙ্গা জল নয়। ভগবানের ভালোবাসায় চক্ষুতে সতত অশ্রুধারা - এই অশ্রু হল জল।

উদ্ধবজী তখন গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে এক গোপীকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানে যোগী কে”? গোপীকা হাসতে হাসতে বলল “এখানে বিয়োগী কে”? বৃন্দাবনের প্রত্যেক নর-নারী প্রত্যাগান্না-রূপে, আত্মযোগাৎ স্থিতিতে ভগবানের সঙ্গে সর্বদা যুক্ত।

ভগবৎ ভক্ত শ্রীমধুসূদন সরস্বতী আত্মযোগাৎ স্থিতিতে অবস্থান করতেন। ইন্দ্রীয় এবং মনের দ্বারা গঠিত এবং নির্মিত এই ধারাতে স্থিরতা লাভের পরই জীবাত্মা চিরন্তন ভাবে পরমাত্মার মহিমাময়, স্থিতির উপলব্ধি করে।



একা- বোকা

গৌতম সরকার

মিনেসোটা, USA

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর কোরে
কেঁদে ফেললো গৌতম।
Morecio এখন ঘরে নেই। তাহলে কার
কাছে মুখ লুকালো ও? নিজের কাছেই?
কান দুটো কি জমে গেলো? নাকটাও কেমন
যেন...। তারপর ধপাশ করে বসে পড়ল ও,
ওর dorm-room এর bunk-bed-এর নিচের
তলাটায়। নাঃ, পাছটা feel করা গেলো।
সেদিনকার কথা মনে পড়ে গেলো ওর,
যেদিন ও সটান চলে গিয়েছিল বিজন সেতুর
পাশের ভারত সেবাশ্রম সংঘে, শুধুমাত্র
বালিগঞ্জের বাড়িটা ছাড়ার ইচ্ছায়। তারপর
কয়েকটা মাস কেমন যেন ঘোরের মধ্যে দিয়ে
কেটে গেলো। আজ Iowa-য় বসে হঠাৎ এসব
মনে পড়ল কেন ওর ?

Morning buddy. Jason-এর গলার আওয়াজ
পেয়ে মুখ ফেরালো গৌতম, দেখলো ও-ও
এদিকেই আসছে breakfast-এর ট্রে-টা হাতে
নিয়ে।

ও, Hi Jason! একটু সরে বসল গৌতম,
campus-cafeteria-র টেবিলটায়।

Hummm, I see, you started eating some of
our foods now, গৌতমের পাশের চেয়ার-টা
টেনে নিতে নিতে বলল Jason। Have you got
any test or quiz today?

Yup, P.Chem in the morning and Calc-II
after lunch. I am not ready for either one.

Why man? Usually you are so prepared!
Scrambled egg-এ fork চালাতে চালাতে বলল
Jason।

Not today, একটু আনমনা শোনালো
গৌতমকে।

Hmmm, home sick?

No. Actually....., actually I would not know
anything about being home sick. I sort of
wanted to run away from my home. And
here I am, exactly on the opposite side of
the globe. একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল
গৌতম।

Well, that makes two of us then. বলে ওর
ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল Jason, hand-shake-
এর জন্য। My parents divorced when I was
two and I grew up watching them fight all
my life, over me and by using me. I just
wanted to get away from BOTH of them, as
far as I could. That's why I chose Iowa for
college, although they wanted me to stay
close to them in California.

My parents are not divorced. They would
not know anything about 'divorce'. My

mom died when I was in 6th grade. I just wanted to run away ever since.

I am sorry to hear that. By the way, are you ready for tonight? It's Halloween Friday today, you know. You must put on a costume. And who knows, you may get 'lucky' tonight, INSTEAD of getting candy. বলে দুবার ভুরু নাচিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল Jason. I know that you like Diana, বাঁ চোখটা মেরে বলল ও. Have you asked her out yet? Tonight is your chance! Okay, I better go. I will catch you later, at lunch perhaps?

See you Jason. Cereal-টা শেষ কোরতে কোরতে বলল গৌতম।

Halloween? ET সিনেমা-য় এর কি একটা scene ছিল না? ঐ যে, বাচ্চারা সব অদ্ভুত রকমের, আর নানান রকমের পোশাক-আশাক পরে বাড়ি বাড়ি যায় চকলেট-লজেন্স পাবার জন্য। New Empire-এ দেখতে গিয়েছিলো না ও সিনেমা-টা? তারপর রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে...

বড় ডিরেক্টর না ঘোড়ার ডিম! বেশ রেগেই বলে উঠল তপোদেব।

আঃ, 'তপা'; একটু আস্তে বল। Aminia-র মেনুতে মোগলাই পুরোটোর price-টায় চোখ বোলাতে বোলাতে বলল সুকোমল।

না রে 'সুকু', ও ঠিকই বোলেছে। সুমন্ত-ও বেশ উত্তেজিত। সত্যি কথাটা বলার সং সাহস না থাকলে কোন কিছুতেই 'বড়' হওয়া যায়

না, বুঝলি? বেশ confidence-এর সাথে কথাগুলো বলে দিল সুমন্ত।

শালা বড় ডিরেক্টর হবে তো হও না, কিন্তু গল্পটার বেলায় ধাপ্লাবাজি কেন বাবা? 'তপা' তখনও উত্তেজিত।

দুহাতের তালুর মাঝে salt আর pepper shaker দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে, ঘাড় গুঁজে একটু আনমনা ভাবে এসব শুনে যাচ্ছিল গৌতম। ভাবছিল মোগলাই পুরোটোর দাম দেবে কোথেকে ও? ওর তো পকেটে অতো পয়সাই নেই। ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললো ও কথাটা।

- তুই চিন্তা করিস না, আমার কাছে কিছু extra আছে, যা খাবি order দে। আশ্বাস দিল সুমন্ত।

- Spielberg যে সত্যজিৎ রায়-এর "বন্ধু বাবুর বন্ধু" গল্পটা ঝেড়েছে, এটা পরিষ্কার। একবার mention করলেই তো পারতো। ব্যাস, মিটে যেতো। একটু স্বগোতোক্তির সুরে বলল গৌতম। তাতে ET ছবিটার মাহাত্ম্য কিছু কমতো বলে তো আমার মনে হয় না। ক্লাস সেভেন-এর ছোকরা-গৌতম একেবারে পাকা film critic-এর মতো করে মত দিল।

- শালা, আমাদের বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট-এর নাম-টাও তো একটু বাড়তো! না কি? ব্যাটা ঐ 'Temple of Doom' কোরতে এসেই মালটা হাতিয়েছে, বুঝলি। খুব sure হয়েই কথাগুলো বলল 'তপা'। মোগলাই পুরোটা এসে যাওয়ায় আর কথা বাড়াতে পারলো না ও।

- We will be closing our breakfast soon, sir; পাশের টেবিল-টা wet-cloth দিয়ে মুছতে

মুছতে বলল campus-cafeteria-র কাজের মেয়েটা। শুনে একটু নড়েচড়ে বোসলো গৌতম। P. Chem-এর notes-গুলোতে আর চোখ বোলানো হোল না ওর।

নাঃ। পরীক্ষা দুটোর কোনটাই ভালো হোল না আজ গৌতমের। Problems গুলো ঠিকঠাক হয়েছে হয়তো, কিন্তু thermodynamics-এর definition গুলো কিছুতেই মনে করতে পারলো না ও। পূজোটাও এবার miss হয়ে গেলো। তবুও এই শেষ October-এর পড়ন্ত বিকেলে মনটা আজ কেমন যেন ফুরফুরে লাগলো ওর। আজ snowing হবার কথা। সেই জন্যই কি? জীবনে প্রথম snow দেখার সুযোগ হবে! চারিদিকটা কেমন সাদা হয়ে যাবে, তাই না? কেমন যেন একটা উত্তেজনা হোল ওর। আচ্ছা, snowing-এর সময় তার মাঝখানে চৈতন্যের মতো দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন হবে, ঐ কোলকাতায় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় বৃষ্টিতে ভিজতে যেরকম ভালো লাগতো সেরকম? Snow-টা যখন পড়বে, সেটা কি powder-এর মতো হবে? হঠাৎ Diana-র কথা মনে পড়ে গেলো গৌতমের। ওর গায়ের চামড়া-টা কি মসৃণ, তাই না? সেদিন hand-shake করার সময় কেমন যেন তুলোর মতো নরম মনে হয়েছিল ওর হাতটাকে। আচ্ছা, ওর চোখদুটো কি নীল? না সবুজ? নীল-সবুজের মাঝামাঝি কিছু একটা হবে বোধহয়। কিরকম একটা অনাবিল আনন্দে মনটা ভরে গেলো গৌতমের। নাঃ, আজ সাহস করে কথাটা বলতেই হবে Diana-কে। নিঃশ্বাসটা কেমন

যেন ভারি হয়ে আসছে, হন্ হন্ কোরে dorm-এর দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করল গৌতম।

কি যেন একটা party চলছে dorm-এর common-room টায়। চারিদিকে সব রঙবেরঙের বেলুন আর নানান size-এর pumpkin দিয়ে নানান রকম সাজসজ্জা। এই pumpkin নাকি আবার খাওয়াও যায়। আচ্ছা, এটা কি fruit, না vegetable? এটা কি আমাদের দেশের কুমড়োর মতো, নাকি তালের মতো? কোনটাই না বোধহয়। তা হলে কি এটা আমাদের দেশের লাউ-এর মতো? না হোলে pumpkin-কে নিয়ে এতো হৈ হৈ করার কি আছে? Pumpkin দিয়ে কি তা হোলে ডুগডুগি বানানো যেতে পারে? ধুর, এ দেশে আবার বাউল হয় নাকি, যে ডুগডুগি হবে? সেদিন আবার TV-তে দেখলাম এক বাবা তার পুঁচকে মেয়েটাকে ডাকছে “pumpkin” বোলে! ঠিক ব্যাপারটা



Illustrated by Maya Sarkar

কি? Pumpkin-কে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? এখানে নাকি একটু পরে air-এ “candy throw” করা হবে! সেটা কিরকম হবে? আমাদের দেশের হরির লুটে বাতাসা ছোঁড়ার মতো? ভাবতে ভাবতে ভিড়ের মধ্যে নিজের অজান্তেই Diana-কে যেন খুঁজতে

লাগলো গৌতম। খুব জোরে music চলছে এখানে, সবাই তার সাথে কিরকম তালে তালে নাচছে। Music-টা কেমন যেন কর্কশ ধরনের, তাই না? ও মনে মনে সুর ভাঁজতে লাগলো...

“লাউ-এর আগা খাইলাম, ডোগাগো খাইলাম, লাহ্ দি বানাইলাম ডুগডুগি, সাধের...” নাঃ, ঠিক জমছে না। খুব একা একা লাগলো গৌতমের। একটু Diana-র দেখা যদি পাওয়া যেতো....., ওর ঐ পাগল করে দেওয়া নীল চোখদুটোর হাতছানি যেন উন্মত্ত করে তুললো গৌতমকে। তবুও, এই ভিড়ের মধ্যেও, একাকিন্সের ভাবটা যেন হতোদ্যম করে দিতে লাগলো ওকে। বাইরে এত ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও জামার ভেতর ঘাম অনুভব করলো গৌতম। বেশ কিছুক্ষণ এর ওর সাথে নাচানাচি করার চেষ্টা কোরল গৌতম, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না ও। কিরকম খাপছাড়া মনে হতে লাগলো ওর। হঠাৎ



পিঠে দুটো আলতো টোকা feel করল গৌতম। পিছন ফিরে তাকাতেই নীল চোখদুটো চিনতে পারলো ও। কিন্তু একী? Diana এরকম সেজেছে কেন? জামা-কাপড় সব কালো, টুপিটাও। হাতে আবার ওটা কি? লাঠি? মুখে কি কালো রঙ মেখেছে ও?

How do I look “গুটাম্”? দুহাত ছড়িয়ে, পা দুটোকে cross করে জিঞ্জেস করল Diana। I

am a witch tonight. হঠাৎ এক পায়ে একটা চরকি-পাক খেয়ে বলল।

ও কি মিটি মিটি হাসছে? মুখে কালো রঙ মাথায় ঠিক ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। ও কি আমায় কাছে ডাকছে? ভাবতে ভাবতে Diana-র একদম কাছে চলে এল গৌতম।

Do you have anything like this in India?

Not really. লালচোখ, কালো কালী ঠাকুরের মুখ, আর দোল-এর দিনের রঙ মাথা মুখের কথা মনে পড়লো গৌতমের, কিন্তু ঠিক বোঝাতে পারবে না বলে কিছু বলল না ও।

ভিড়টা বোধহয় একটু পাতলা হয়ে আসছে। রাত কত হোল? একটা দেড়টা হবে বোধ হয়। ভোর চারটেয় আবার কাজ আছে। Snow shovel করতে হবে, on-campus job-এর জন্য। Homework-গুলো না হয় পরে করা যাবে এখন...

“গুটাম্”, would you like to come to my room upstairs?

May be some other time, সন্ধ্যার সাথে বললো গৌতম।

Come on. It’s Friday night. Let’s enjoy.

No, I mean.... actually..... I have to work in a couple of hours. I have to shovel snow at 4. কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো গৌতমের।

Come on “গুটাম্”, I really mean it. বলে ওর ডান হাতটা বারিয়ে দিল Diana. Let’s have a couple of beer before you need to go to

work. Besides, I have a surprise for you, I think.

দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে Diana-র বাড়ানো হাতটা ধরল গৌতম। আহ, কি নরম!

Shhhh, carfew hours is in effect, ঠেঁটে বাঁ হাতের তর্জনী আঙুলটা ঠেকিয়ে বোলল Diana! তারপর খুব সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে dorm-এর দোতলার women's floor-এ উঠে এলো ওরা। Hallway-তে ঢোকান double-door-টা ঠেলতে ঠেলতে কপালের ঘামটা চট্ট কোরে রুম্মালে blot কোরে নিলো গৌতম। এতো গরম লাগছে হঠাৎ...

কিসের আওয়াজ আসছে Diana-র ঘর থেকে? TV-র? Hallway-তে Diana-র room-এর দিকে এগোতে এগোতে মনে হোল গৌতমের। কি আশ্চর্য, চাবি দিয়ে না খুলে ও ঢোকা মারছে কেন দরজায়?

Baby please open the door, it's me, whisper কোরে দরজার কাছে মুখ রেখে বোলল Diana. কালো জামার সাথে কালো tie পরা একটা ছেলে দরজা খুলতেই Diana ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকুর ওপর।

Baby, remember, I told you? Please meet my 'Indian friend' "গুটাম্"। He is such a sweetheart. He said that he would make me chicken curry some time. I absolutely adore him. Can you imagine they gave him a job to shovel snow? Poor thing just came from tropical part of India!

Oh, I am so sorry, "গু- গুটাম্?" দরজার মুখে দাঁড়িয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে বলল ছেলেটা, hand-shake-এর জন্য।

"গুটাম্", please meet my boyfriend "Ken", খিল খিল কোরে হেসে বলল Diana. He came all the way from Nebraska, to spend the Halloween weekend with me. Isn't that sweet?

লজ্জায়, রাগে, দুঃখে চরম অপ্রস্তুত আর অপমানিত feel করল গৌতম। এত বোকা লাগলো নিজেকে! কোনরকমে Ken-এর সাথে একটা hand-shake করে বেরিয়ে এল Diana-র ঘর থেকে। তারপর সোজা চলে গেলো snow shovel করতে। এই ঠাণ্ডায় snow shovel করার জন্য ওর জামা-কাপড় আর জুতোজোড়া যে একেবারেই যথেষ্ট নয় সে কথা মনেই এল না গৌতমের। টের পেলো, যখন খানিষ্কণ snow shovel করার পর বুকুলো যে কান দুটোকে আর feel কোরতে পারছে না ও। নাকের ডগাটাও না। আঙ্গুলের ডগাগুলোও কেমন যেন আড়ষ্ট...

"গাউটুম", you better go home. একটু ইতস্ততঃ স্বরে বোলল Miles, maintenance team-এর supervisor লোকটা। I don't feel safe for you to work here right now. You are freezing. Do you have snow-coat and snow-boot? You will need them to work here. Let me know if you need any help, I may have some extra pairs that may fit you.

কোনোরকমে টলতে টলতে campus-এর রাস্তাটা ধরে সোজা dorm-এ ফেরত এলো

গৌতম। দোতলার women's floor-টা cross করে তিনতলার men's floor-এ যাবার পথে কেমন যেন বিরক্ত লাগলো ওর। প্রথম snowing-টা কেমন যেন miss হয়ে গেলো... রাগ হোল নিজের ওপরেই। তারপর কোনোরকমে ঘরে ঢুকে দুহাতে মুখ চেপে ও বসে পড়ল ওর bunk-bed-এর বিছানায়। নিজের নাক-কান গুলোকে feel করার চেষ্টা কোরল খানিকক্ষন, তারপর আর কিছু ভাবতে পারলো না ও...

দরজায় হঠাৎ চাবির শব্দে উঠে বসার চেষ্টা করল গৌতম, কিন্তু আবার শুয়ে পড়ল।

Hey man, উঁচু স্বরে ওর পর্তুগীজ accent-এ বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো Morecio. Are you okay? You have been sleeping all day! I was in earlier, and you were snoring like a pig!

Really? নাকটা আছে তাহলে! কান দুটোকেও একবার touch কোরে দেখে নিলো গৌতম। I am so sorry, hope I did not bother you. What time is it?

It's about 8, in the EVENING that is. ঘাড়টা কয়েকবার ওপর-নিচে নাচিয়ে, একটু মজা কোরে বললো Morecio. You missed both brunch and supper.

It's okay. I am not hungry. Blanket-টা সামলাতে সামলাতে বললো গৌতম।

I got to go now. Help yourself with some snack on my desk, that my mom sent from Brazil. After all, what are room-mates for, ha? মজা করে হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলো Morecio.

Brazil কথাটা শুনে গৌতম মনে করার চেষ্টা করলো কোলকাতায় এখন ঠিক কটা বাজে। রবিবার সকাল ৮-টা মতো হবে না? সময়-টা কেমন যেন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে! একটু পয়সা থাকলে একটা ফোন করা যেতো। কি ভালোই যে হতো তা হোলে! বড্ডো একা লাগছে ওর এখন। বোকাও।



আইসল্যান্ডে Ice কোথায় রে

দময়ন্তী ঘোষ

আমাদের আইসল্যান্ড বেড়ানোর ছবি দেখতে শুরু করে আমার মায়ের প্রশ্ন। সত্যিই তো! আমাদের দশ দিনের বেড়ানোর প্রথম দুদিনের ছবিতে



আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ আছে, ধূ ধূ প্রান্তরে হঠাত্ নেমে আসা বিশাল জলপ্রপাত আছে, টগবগ করে ফোটা গরম জল ও বাষ্প উদ্গীরণরত অজস্র ছোট বড় গাইজার আছে, এমন কি, পৃথিবীর দুটো টেকটনিক প্লেটের নড়ানড়িতে সৃষ্টি ভয়াভয় অতল ফাটলও আছে। কিন্তু আমার মাকে চমক দেওয়া অত সোজা না। মায়ের মৌলিক প্রশ্নটা থেকেই যায় - আইসল্যান্ডে কি Ice নেই? উত্তর দি পরশুরামের ভাষায়: আছে, আছে, জানতি পারো না। আইসল্যান্ডের দশ শতাংশ গ্লেসিয়ার (তুলনায় আমেরিকার একেরও কম শতাংশ গ্লেসিয়ার)। তবে এদের দেখতে পেতে আর একটু দেশটার ভেতরে ঢুকতে হয় - যেটা আমরা শুরু করলাম তৃতীয় দিনে। ফলে মা বরফ দেখতে পেলেন পরের ছবিগুলোতে - গ্লেসিয়ারের দিগন্ত জোড়া বরফ, গ্লেসিয়ার লগুনে গ্লেসিয়ার থেকে ভেঙ্গে পড়া নানা আকৃতির ভাসমান

বিশাল বরফের চাঁই। তহলেও - গ্রীনল্যান্ডের তো আশি শতাংশ বরফে ঢাকা! তবে এই দেশটার নাম আইসল্যান্ড হলো কেন? প্রায় বারশ' বছর আগে, নিজেদের দেশে জায়গার টানাটানি পড়ায় নড়ডিক দেশগুলোর লড়কে-লেঙ্গা ভাইকিংরা জাহাজে করে জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে আইসল্যান্ড আবিষ্কার করে ও বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। গরম কালটা মন্দ যায় নি। কিন্তু শীতকালে দ্বীপটার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ঐ বসতি বরফে ঢাকা পরে - ফিওর্ডের জল সব জমে বরফ হয়ে যায়। বিরক্ত হয়ে ওরা দেশটার নাম দেয় আইসল্যান্ড। আইসল্যান্ডের দোষ কি? সুমেরু বৃত্ত কালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আলাস্কার মধ্যভাগ আর আইসল্যান্ড একই অক্ষাংশে। সুতরাং আরও বেশীই তো ঠাণ্ডা হবার



কথা এখানে! আসলে আইসল্যান্ডের আবহাওয়াটাকে খানিকটা নাতিশীতল করে রেখেছে আটল্যান্টিকের একটা উষ্ণ গাল্ফ স্ট্রিম। ফলে শীতকালে বিংহ্যামটনের থেকে ঠাণ্ডা কম, বরফও কম -

অন্ততঃ রেইক্যাভিকে – আইসল্যান্ডের সবথেকে বড় (একমাত্র বড়) শহর ও রাজধানীতে। গরমকালে জুলাই মাসের শুরুতে আমরা যখন গেছি, গরম ৬০°ও কম - বিংহ্যামটনে তখন লোকে হাঁসফাঁস করছে ৯০° তে।

আমরা উল্টে হাসাহাসি করলাম আইসল্যান্ডের জনসংখ্যা নিয়ে। দেশটাতে থাকে টেনেটুনে মাত্র হাজার সোয়া তিনশ' লোক - বেশীর ভাগই থাকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রেইক্যাভিকে ও তার আশেপাশে। এত কমে গিয়েও আমাদের ব্রুম কাউন্টির জনসংখ্যা দুশ' হাজারের মত। কলকাতার থাকে প্রায় পাঁচ মিলিয়ান লোক; নিউ ইয়র্ক শহরের থাকে প্রায় আট মিলিয়ান লোক। লগুনে আমাদের নৌকোর আইসল্যান্ডিক চালক খুব একটা ভুল বলে নি যে আইসল্যান্ডের জনসংখ্যা নিউ ইয়র্ক শহরের একটা পাড়ার জনসংখ্যার সমান। মাপে দেশটা কিন্তু খুব ছোট না - সুইটজারল্যান্ডের আড়াইগুন - অথচ জনসংখ্যায় চার শতাংশ। অবাক লাগে। দেশটা ঘুরে আমার মনের প্রশ্নটা অবশ্য উল্টো ধরনের: এরকম একটা জায়গায় ভাইকিংরা থেকে গেলো কেন? উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের টেকটনিক প্লেট যেখানে ঘষাঘষি



করছে ঠিক তার ওপরে দেশটা। ফলে দেশজুরে রয়েছে এক গাদা

আগ্নেয়গিরি – মৃত, সুপ্ত, জাগ্রত; অজস্র গাইজার যার থেকে বেরোচ্ছে গরম কাদা, গ্যাস, অথবা ফুটন্ত জল, গরম ধোঁয়া – যেন পৃথিবীর পেট ফেটে বেরিয়ে আসছে নাড়িভুঁড়ি; এদিক ওদিক আচমকা অতল গর্ত, ফাটাফুটো –

রাতে এখানে নিশ্চই হাঁটাচলা বারণ! রাস্তার দুধারে মাইলের পর মাইল শুধু মসে ঢাকা লাভার মাঠ। বড় গাছ চোখে পরে না। গাড়ীতে যেতে যেতে চাষবাষ যতটুকু চোখে পড়ে সবটাই ঘাসের – ভেড়া, গরু, ঘোড়াদের খাওনোর জন্য। আমরা দশদিনের জন্য বেড়াতে এসে দেশটার অভিনবস্বে মুগ্ধ। চিরদিনের জন্য এরকম প্রতিকূল পরিবেশ বেছে নেবো কেন? পরে খোঁজখবর ক'রে জনলাম – ভাইকিংরা প্রথমে যখন আসে অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। আগ্নেয়গিরি, গাইজার, গ্লেসিয়ারের কারণে দেশের দুর্গমতা তখনও ছিল। কিন্তু তখন যেটা তখন অনেক বেশী ছিল – অন্ততঃ এখনকার তুলনায় – সেটা হলো গাছপালা –



বিশেষতঃ বার্চ গাছ (আর ছিল এবং এখনও আছে – মাছ – অনেক মাছ – দ্বীপটার চারদিকের সমুদ্রে, ভেতরের অজস্র নদীতে ও হ্রদে)। জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন আর নির্বিশেষে ভেড়া, গরু, ঘোড়া চরতে দেওয়ার ফলে আজ দেশটার মাত্র সিকিভাগ কোনমতে সবুজ, এক শতাংশ জঙ্গল, আর এক শতাংশ চাষ করার উপযোগী। ভুলটা সংশোধন করতে এখন বিদেশ থেকে অনেক গাছ এনে লাগানো হচ্ছে – রাস্তা থেকে চোখে পড়ে মানুষের পোঁতা সারি দেওয়া

গাছ। ভূমিসংরক্ষণের জন্য আলাস্কা থেকে বুনো ফুলের বীজ ছড়ান হয়েছে - রাস্তার দুধারে লুপিনের গাঢ় নীল চোখ জুড়িয়ে দেয় - টেক্সাসের ক্লবনেটের মত। শুনলাম এর ফলে রাস্তায় বিপজ্জনক ধুলোর ঝড় বন্ধ হয়েছে।

প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করার অদ্ভুত ক্ষমতা দেশটার। গ্লেসিয়ারে বসবাস করা যায় না, কিন্তু গ্লেসিয়ারগলা জলের স্রোত থেকে বিদ্যুত তৈরী করা যায়। আগ্নেয়গিরি, গাইজার - এরা ভয়ঙ্কর, ধ্বংসাত্মক, কিন্তু এদের জিওথারমাল শক্তি দিয়েও বিদ্যুত তৈরী করা সম্ভব। আজ আইসল্যান্ডে ব্যবহৃত বিদ্যুতের উৎস সিকিভাগ জিওথারমাল, বাকীটা জল। ১৯৭৫-৮৪তে দেশের উত্তরে একটা এলাকা ফেটেফুটে ছারখার হয়। আমরা জায়গাটা হেঁটে খানিকটা দেখলাম। মাইল জোড়া মহাশ্মশান। এখনও ধোঁয়া উঠছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ অর্ধেক ভেঙ্গে পড়ে আছে। প্রকৃতির আদি রূপ। ভয় পাওয়ার মত। এখানে একটা বিদ্যুত তৈরীর কারখানা শুরু হচ্ছিল - বিস্ফোরণের কারণে সেটা স্থগিত থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ খুশী - কারণ প্রকৃতির এই তাগবন্ত্যের ফলে কারখানার বিদ্যুত তৈরীর ক্ষমতা দেড়গুন হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আইসল্যান্ড। গাইজারগুলোর গরম জল দেশের বেশীর ভাগ বাড়ীর গরমজলের কাজে লাগানো হয় (তাই একটু সালফারের গন্ধ)। বাড়ী গরমও হয় ঐ গরম জলে। গাইজারের অভাব তো নেই - তাই গরমজল ও হিটিং খুবই সম্ভা। বাড়ীর ডেক, ড্রাইভওয়ে, ফুটবল খেলার মাঠ, শহরের অনেক রাস্তা - সবই শীত কালে গরম করে রাখা যায়। বরফ

পরিষ্কার করার ঝামেলা নেই। গ্রিনহাউজ গরম রেখে আলো জ্বালিয়ে সস্তী ফলানো অনেক সহজ এখন। বছরের বড় একটা সময়ে সূর্যালোকের অনুপস্থিতি ফসল ফলানো বন্ধ করে না। গাড়ীর জন্য পেট্রল বাদ দিলে দেশটাতে এখন এনার্জির আধিক্য। শুনলাম কোথাও একটা সমুদ্রের জল গরম করারও ব্যবস্থা হয়েছে সমুদ্রে স্নানের আরামের জন্য। এটা হয়তো বাড়াবাড়ি। কিন্তু দৈনন্দিন সাঁতারের জন্য সার্বজনিক গরম জলের পুল সর্বত্র - কিছু বাড়ীর ভেতরে, কিছু বাইরে; আর শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে ঐ পুলে সাঁতার কাটা ও তার পাশের হট টাবে বসে আড্ডা মারা হচ্ছে আইসল্যান্ডের লোকেদের সবথেকে প্রিয় অবসর বিনোদন - আমাদের পুরনো কলকতায় রকে বসে রাজাউজীর মারার মত। এসব পুলগুলোর বেশীর ভাগই জিওথারমালি গরম। এছাড়া আছে এদের বিখ্যাত 'ক্ল লগুন'। নিরাশ হয়েছিলাম এটা প্রকৃতির নিজের তৈরী না জেনে। কিন্তু যেভাবে এরা বিদ্যুৎ



তৈরীর কারখানা থেকে বেরুনো গরম জলটা থেকে বিশাল সুন্দর একটা স্পা তৈরী করে জনপ্রিয় করেছে - দেখার মত। 'ক্ল লগুন'এ

স্নান নাকি গায়ের চামড়ার অনেক অসুখ সারায়।

আমরা গা ভেজালাম ধোঁয়া ওঠা গরম একটা পাহাড়ী নদীর জলে। নাকেমুখেচোখে ঢুকে পড়া ভনভনানো আইসল্যান্ডিক মিজিটদের সঙ্গে ঘন্টা দেড়েক ধরে যুদ্ধ করতে করতে পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে জলকাদা পেড়িয়ে শেষে একটা গাইজারের অঙ্ক করে দেওয়া ধোঁয়া ও গর্জনে

ভয় পেয়ে – আমি ভীতু মানুষ – সকলকে নিয়ে ফিরেই আসছিলাম। পরিবারের বাকী সকলের উৎসাহে ভাগ্যিচ ফিরি নি। আর কয়েক বাঁক হাঁটার পরই পাওয়া গেল গরম জলের পাহাড়ী নদী। নদীর দুপাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালু পাড়। তার পর পাহাড়। মাথার ওপর খোলা নীল আকাশ। নদীর উষ্ণ স্রোতে গা মেলে দিয়ে মনে হল মোক্ষ পেয়েছি।



Poems

Sushma Madduri



Life has gifted us with a few exotic things..
It's a mystery to wait to see what each of it brings!!
Some of them are longing memories from the
past..
While others are momentary sparkles that last !!

A dull winter garden shall be filled with
flowers..
When spring sets in with vivid colors!!



A lonely journey wouldn't last long..
When a bright friendly smile comes along!!



Did the moon seem bigger today ?

Or did a nourishing scent lead your way?

Certain things are beautiful as untold and unseen..

Yet exploring is irresistible, the mind is so keen!!

Interesting things often happen..

When you dare to step out of your mind's den!!

And it is nothing strange..

But a nature's way to engage!!

In an experience that can only be felt..

Like an after-taste from a chocolate melt!!



অন্য পৃথিবী

উৎপল রায়চৌধুরী

একটা ছবি আঁকবার চেষ্টা করছিলুম মনের
আয়নায়া।

পাহাড়ি ঝর্ণার মত প্রাণবন্ত ছ সাত বছরের
একটি উচ্ছল মেয়ে। সূতীর একটা ফ্রক জামা
পরে, হাতে স্লেট আর চকখড়ি নিয়ে চলেছে
নাচতে নাচতে ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। সঙ্গে
বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বছর দশকের দাদা।

“এই ছোড়দা, একটু খানি দাঁড়া না। এই কটা
কুল তুলে নিয়েই আসছি”।

“দেরি হচ্ছে। মাষ্টার মশাই বকবে রে। এখনো
তো পাক্ষা দু মাইল যেতে হবে”। একটু থমকে
মেয়েটি আবার হাঁটতে শুরু করলো জঙ্গলের
মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথে।

আনমনা এই ভাবনা কেটে গেলো হটাৎ
করেই। দেখি আমার মা একটা ছোট টুলের
ওপর দাঁড়িয়ে একটা খুবই উঁচু তাক থেকে
কিছু একটা জিনিস নামিয়ে আনছেন একটা
লম্বা লাঠি দিয়ে। আমি নিজেই প্রায় তিন
চতুরথাংশ জীবন কাটিয়ে এসেছি। দেখে
আঁতকে উঠি।

“মা, পড়ে যাবে তুমি”।

“কিছুটি হবেনা”, মা হাসতে হাসতে বললেন,
“আমি হচ্ছি সাপে কাটা মেয়ে। আমি সব
সামলে উঠতে পারি”।

ছোটবেলায় আমরা সব ভাইবোন মার
বিছানায় উঠে মাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে
বলতাম, “মা, গল্প বোলো”। আজ আমরা
পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে গেছি। তবু
সেদিনকার মতোই বললাম, “ঠিক আছে, সেই
গল্পই বোলো আবার”। টুকরো টুকরো ভাবে
গল্পগুলো যে আগে শুনিনি তা নয়। তবু
ইচ্ছেটা হোলো আবার সে গল্প শোনার। আমি
জানি মার গল্প বলার ধরন। বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ বইটার লবটুলিয়ার
জঙ্গল চোখের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে
মার গল্পের বাঁধনে।

“ঠিক আছে, আজ
দুপুরে খাবার পর,
কেমন?”, মা
বললেন।



তাই হোলো। আকাশ
ভেঙ্গে বাদলা নেমেছে
দুপুরবেলা। আমি আর আজ এখানে উপস্থিত
আমার দুবোন মার বিছানার চারপাশে।

“তোরাতো জানিসই আমার ছেলেবেলাটা কেটেছে এক প্রত্যন্ত চাৰাগানে। সব চাইতে কাছের স্কুল ছিলো আড়াই মাইল দূরে ছোট্ট একটা শহরে। শহরটার নাম ছিলো পালংঘাটা। স্কুলের রাস্তাটা ছিল জঙ্গলে ভরানো। আর সে কি জঙ্গল। তোরা কোলকাতা কিম্বা নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়াতে বসে তা ভাবতেই পারবিনে। সকালবেলায় আমি আর দাদা বেরিয়ে যেতাম স্কুলে যাবার জন্যে”।

“স্কুল বাস?”, পাশে বসা নাতনী ফুট কাটল।

“এই পাকাবুড়ী, গল্প শুনবিতো শোন চুপটি করে”।

“ঠিক আছে ঠামা, আমি কিন্তু তোমার কোলে বসে শুনবো”।

“আয় তবে”, বলে মা টেনে নিলেন আদরের নাতনীকে কোলে। আর শুরু হোলো গল্প।

শ্রাবন মাসই হবে সেটা। ঝমঝম করে যখন তখন বৃষ্টি পড়ছে। আর উঠোন থেকে এক পা বেরোলেই কতো রকমের গাছগাছালি, লতাপাতা। আর সে জঙ্গলের রঙ যে কি উজ্জ্বল গাড় সবুজ, তা কি বলবো। রং বেরঙের কতো পোকা। কোনটা যে কি তা চেনার সাধ্যই নেই। অনেক ছোটোখাটো সাপখোপ, যেগুলোকে আমরা বিশেষ পাতা দিতাম না। আর সন্ধ্যা হলেই তো ঝিঁঝিঁপোকাকার গানে কান দুটো ঝালাপালা। তবু একটুখানি একঘেয়ে লাগছিলো মাঝেমাঝেই। অতো বৃষ্টিতে তো আর এই জঙ্গল ভেঙ্গে স্কুল

যাওয়া নেই। আর বাড়ীতে থেকেই বা কি করা। কতক্ষনই বা ছোড়দার সাথে একটা দোকা বা অন্য কিছু খেলা যায়। পুতুল খেলাটা কখনই আমার ঠিক ভালো লাগতো না। তাই সময় কাটানোটা এই বাদলা ঝরা দিন গুলোতে হয়ে যাচ্ছিল একটা সমস্যা।

এমন সময় ‘মুশকিল আসান’। একদিন বাবা কাজ থেকে ফিরে বললেন, “এই, তুই আর তোর ছোড়দা যাবি তোদের ছোটোকাকুর ওখানে কদিনের জন্যে”? আর আমাদের পায় কে? আমরা তো একপায়ে খাঁড়া। পরিবেশটাতো একটু পালটাবো। আর ছোটো কাকীমার ক্ষীরের নাড়ু, সে যে সাফাং অমৃত।

“কবে যাবো বাবা”, আমরা চেপে ধরি বাবাকে।

“যাবি তো কালই চলে যা। স্কুল তো অমনিতেই হচ্ছেনা। ট্রলির ব্যবস্থা করা আছে। রামচরন যাবে তোদের সাথে। সকাল দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়িস তোরা”। মার দিকে তাকিয়ে বললেন, “সকাল সকাল একটু ডাল ভাত করে দিও। ওরা দুজনে ওটা খেয়ে বেরিয়ে পড়তে পারবে”।

ছোটো কাকুর বাড়ী যাওয়াটা একটা ‘অ্যাডভেঞ্চার’ ছিলো আমাদের কাছে। ওখানে যাবার অর্ধেক আনন্দ ছিল যাবার রাস্তাটুকুতে। ওঁদের বাড়ী আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে। তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলে ওটা ছিলো অনেকখানি দূর। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হতো প্রায় মাইল

তিনেক ঘোড়ায় টানা ট্রলি চেপে। সে ভারী মজা। মনে হতো জঙ্গলটা সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে যাচ্ছে। যদিও এখন বুম্বি ঘোড়াটা আসলে যেতো দুলকি চালে ট্রলিটা টানতে টানতে আর আমরা বসে থাকতাম ওটার ওপর। শেষ দু মাইল অবশ্য আর ট্রলি লাইন ছিলো না। সেটুকু যায়গা আমাদের হেঁটেই পেরোতে হতো ট্রলিটা ওখানে রেখে। তবে ঘোড়াটাকে ট্রলি থেকে খুলে নিয়ে সাথেই নিতে হতো। নাহলে দিন তিনেক পর ফিরে এসে আর ওটাকে পাওয়া যেতো না ওখানে। বাঘে খেয়ে রেখে যেতো।

নাতনী চোখ বড় বড় করে বললে, “তোমাদের ভয় করতো না ঐ জঙ্গলে হেঁটে যেতে”?

“না রে, বাঘে সেটা জানতো কি না জানিনে, তবে আমাদের জানা ছিল যে এখানকার বাঘগুলো সুন্দরবনের বাঘগুলোর মত মানুষখেকো নয়। বরং মানুষ থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসে ওরা। আর ঐ বয়সে কি কারো ভয়ডরের বালাই থাকে”?

ট্রলি লাইনের শেষে রামচরন ট্রলি খামিয়ে নেমে গেলো ঘোড়াটাকে খুলে দিতে ট্রলি থেকে। আমি আর ছোড়দা বসে ছিলাম ট্রলিতেই। কমিনিট পর রামচরন বললে, “তোমরা এবারে নেমে আসতে পার”। কথাটার সারবস্তু এটাই, তবে ঠিক এভাবে বলেনি সে। যা বলেছিলো, তা হলো, “ঘুড়াটা খুলি লাইছি, তুমরা নামি যাও এখন”। ছোড়দা শুনেই তিড়িং করে দাঁড়িয়ে পড়লো আর নেমে পড়বার জন্যে পা বাড়াল। তার পরই দেখি

সে দিল মস্ত এক লাফ। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই আমিও পা বাড়িয়েছি নামবার জন্যে। আর হাতে পড়লো এক হ্যাঁচকা টান।

“টানলি কেন?”, জিপ্তেস করি ছোড়দাকে।

“তুই তো একটা সাপের ওপর দাঁড়িয়েছিলি।”

ছিলাম তো ছিলাম। ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। আমি ব্যাপারটাকে পাতা না দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম ছোড়দার সঙ্গে। পেছনে রামচরন আসছিলো ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে। একটু পরে সে কিন্তু চেঁচিয়ে উঠলো, “এই, থামো তোমরা।” ওর কথাগুলো হুবহু বলছি না তোদের কারণ তোরা অল্প খানিকটাই বুঝতে পারবি আর মিছিমিছি হেসে কুটোপাটি যাবি। যাহোক, ওর বক্তব্যের সার কথা হলো, এখানে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ এলো কোথা থেকে।

“আমরা তার কি জানি”, বলে এগোচ্ছিলাম আমরা আবার। হটাৎই ছোড়দা বললে, “অ্যাই, রক্ততো বেরোচ্ছে তোর পা থেকে”।

সেকিরে? এবারে আমিও একটু ঘাবড়ে গেছি। এদিকে রামচরন এক লহমায় বুঝে গেছে কি ব্যাপার। বললো, “তাড়াতাড়ি ট্রলিতে ওঠো তোমরা। বাড়ী ফিরে যাব আমরা এখন”, বলেই আবার ঘোড়াটাকে ট্রলিতে জুততে লাগলো আবার। আমরাও তখন আন্দাজ করতে পেরেছি কি হয়েছে। সেটা আর কি এমন বড় ব্যাপার। কিন্তু ছোটোকাকুর বাড়ী যে যাওয়া হচ্ছেনা এখন, সেটাই হলো আমাদের দুজনার মন খারাপ হবার মুখ্য

কারণ। তবে রামচরনের কথাতো মানতেই হবে। ওকে না করবে, কার সাধিয়া। ব্যাজার মুখে আমরা দুজনে আবার উঠে পড়ি টুলিতে। ফিরতে ফিরতে বেলা প্রায় গড়িয়ে গেল। আমার সেরকম কিছু আসুবিধে হচ্ছিলো না, কিন্তু কেমন যেন একটা ঝিমুনি আসছিলো। আর ছোড়দাটা কোনও কারণ ছাড়াই আমস্বস্তের মত মুখ বানিয়ে পুরো রাস্তাটা বসে থাকলো।

বাড়ী এসে সে আরেক ব্যাপার। টুলি লাইনের পরেও প্রায় সিকি মাইল হেঁটে বাড়ী আসতে হয়। রামচরন জোর করে আমাকে কোলে তুলে নিলো। ছোড়দা আসতে লাগলো পেছন পেছন। আর বাইরের উঠোনে এসেই রামচরন তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করলে, “মাঠাকরুন, শীগগির বাইরে এসো। সাপে কেটেছে মেয়েকে। বেজাতের সাপ মনে হচ্ছে গো।” মা তো বেরিয়ে এলেন ছুটে, সঙ্গে বাড়ীর ঝি। কিন্তু কি করবেন ভাবতেই লাগলো দু মিনিট। তারপর বললেন, “ও থাক এখানে, আমি দেখছি। তুই যা, বাবুকে খবর দো। কাজ থেকে যেন এফুনি চলে আসে।” রামচরন ‘যাচ্ছি’ বলে চলে গেল। মা, মানে, তোদের দিদা ঝিকে বললেন, “মা তো, কিছু দড়ি নিয়ে আয়।” দড়ি এলে মা আমার পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু অবধি বেঁধে দিলেন কয়েকটা জায়গায়। এতক্ষন ব্যথা হয়নি কিন্তু এখন আমার ব্যথা লাগছিল। আর কিছুক্ষন পর পা টা নীলচে হয়ে যাচ্ছিলো রক্ত জমবার জন্যে। তোদের ভাষায়, হয়তো অক্সিজেন না পেয়ে।

বাবা এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা নেমে গেছে। কিছুই করবার ছিলনা ওঁর। আমার মা নাতনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তখন তো আর তোদের মতো আমাদের সবার হাতে হাতে সেলফোন ছিলো না। তুই তো সেটা ভাবতেও পারিস নে”। আমাদের দিকে তাকিয়ে মা বললেন, “তোদের দাদু দিদার কি অবস্থা তখন, তা ভাবতে পারিস তোরা। ওঁরা তো বুঝে গেছেন, সাপটা বিষাক্ত আর এফুনি কিছু করা দরকার। কিন্তু কোনও উপায় নেই। ভাবতে পারিস, ওঁরা নিজেদের কি রকম অসহায় ভাবছিলেন তখন”। রামচরনকে দিয়ে খবর পাঠানো হলো এলাকার ওঝাকে। ঘন্টা দুই পরে সে ফিরে এলো ব্যাজার মুখ করে। ওঝা গেছে মাইল ছয়েক দূরের অন্য একটা চা বাগানে। কাউকে সাপে কেটেছে ওখানে। ওই কাজ শেষ করে আসতে আসতে সকাল হয়ে যাবে। তখন আর কোনও উপায় নেই ভগবানের নাম নেয়া ছাড়া। পালংঘাট এমনই এক শহর যে কোনও ডাক্তার নেই সেখানে। তার পরের শহর থেকে এত রাতে ডাক্তার ডেকে আনার প্রশ্নই ওঠে না। শহরটা মাইল কুড়ি দূরে। আর রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা, যাবার জন্যে বাস বা অন্য কোনও গাড়ি, কোনও কিছুই ব্যবস্থা নেই। ওখানে যাওয়া মানে পুরো দিনের ধাক্কা।

যাহোক, কোনও রকমে তো রাতটা কাটল। এই অজ প্রত্যন্তে তো অন্য উপায় ও নেই কিছু। মা, মানে, তোদের দিদা, মাঝে মাঝেই আমার পায়ের বাঁধনগুলো আরও কষে বাঁধছিলেন। সকালবেলায় বড়দা বেরিয়ে গেলেন

পাশের শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে।
ওখানে নাকি একজন ডাক্তার আছেন, যিনি
সাপে কাটা লোকদের চিকিৎসায় বিশেষ
অভিজ্ঞ। আর লোক পাঠানো হোলো
ছোটোকাকুকে নিয়ে আসবার জন্যে। সেই পাঁচ
মাইল দূরের চাবাগানে, যেখানে গতকালই
সকালবেলা ছোড়দা আর আমি যাচ্ছিলাম খুব
করে মজা করতে।

আর তার খানিকক্ষণ পরেই বাড়ীতে এসে
পৌঁছল সেই ওঝা, যাকে গতরাতে রামচরন
ডেকে আনতে গিয়েছিলো। এদিকে আমি
ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছিলাম। সারা পা কালচে
নীল আর লাল রঙে মেশানো একটা বিচ্ছিরি
চেহারা নিচ্ছিলো। তার ওপর খিকখিকে
রসভরা চাকা চাকা ফোস্কা ফুটে উঠছিল সারা
পায়ে। কিচ্ছুটি না করলে বিকেল পর্যন্ত
ডাক্তার এসে পৌঁছনো অবধি হয়ত আমি আর
বেঁচে থাকবো না, এ সব ভেবে আমাকে
ওঝার হাতে সাঁপে দেয়াটাই ঠিক করলেন
তোদের দাদু, দিদা মিলে।

ওঝাদেরও খুবই নিজস্ব অনেক নিয়মকানুন
থাকে। আমার তো কিছুই মনে নেই, একে
বয়েস কতো কম, তার ওপর সারা শরীরে
যথেষ্ট যন্ত্রণা। আমি পুরো ব্যাপারটাই পরে
বাড়ীর অন্যান্যদের কাছে শুনেছি। ওঝার নাম
গাভরু মিঞা। প্রথমেই সে বললো, বাড়ীর
কোনও পুরুষ মানুষ সামনে থাকতে পারবে
না। সবাই তখন ভেতরের উঠোন, যেখানে
আমায় বসিয়ে রাখা হয়েছিলো, সেখান থেকে
বাইরের ঘরে চলে গেলেন। তোদের দিদার
কাছ থেকে সে চাইলো একটা নূতন গামছা।
তারপর বিড়বিড় করে কি সব বলতে থাকলো

বেশ খানিকক্ষণ। থেকে থেকে ও নাকি
আমাকে ওই গামছাটা দিয়ে চাবুকের মতো
পেটাচ্ছিলো। আরও কিছু সময় পরে সে নাকি
শুরু করলো জোরে জোরে অশ্রাব্য সব
গালিগালাজ। সেগুলো নাকি মা মনসা, যিনি
নাকি সাপেদের দেবতা, তাঁর আর তাঁর
চেলাচামুণ্ডাদের উদ্দেশ্যে। আর থেকে থেকে
আমাকে সে পিটিয়ে যাচ্ছিলো ওই গামছাটা
দিয়ে। আমার অবশ্য ওসব কিছুই মনে নেই।
আর সে আমার পায়ের থেকে উরু পর্যন্ত
বাঁধনগুলো মার চাইতেও কষে বেঁধে
দিয়েছিলো। তারপর হটাৎই নাকি সে বললো
যে তার অত্যন্ত জরুরী কিছু গাছের শেকড়
জোগাড় করতে এফুনি তাকে জঙ্গলে যেতে
হবে। বেরিয়ে গেল সে। যাবার আগে মাকে
সে বলে গেল যে আমি যে রকম আছি, ঠিক
যেন ও রকমটি থাকি।

ফিরে এসেই তার সে কি তড়পানো। “কে
ছুঁয়েছে ওকে? আমি আর এ রোগীকে
ঝাড়ফুক করে বিষ নামাতে পারবো না, আমি
চললাম”। বাড়ীর সবার মাথায় বাজ। সে
কিন্তু কোনও উপরোধ শুনবে না। শুধু বলে
যাচ্ছিলো, “বলো আমাকে, কে ওকে ছুঁয়েছে”?
তোদের দিদা বললেন, “না, কেউ তো
ছোঁয়নি”। “না, সে হয়না। ভেবে দেখুন মা
ঠিক করে আর তাড়াতাড়ি বলুন। না হলে
আমি আর কিছু করতে পারবো না”। অনেক
ভেবে তখন মনে পড়লো সবার যে বাড়ীর
বৃদ্ধা কাজের মহিলা, যে আমার জন্মের বহু
বছর আগে থেকেই আছে, সে আমায় একটু
আদর করে দিয়েছিলো। সেটা স্বীকার করে

নেবার পর গভরু মিঞা সামান্য শান্ত হোলো, কিন্তু রাগ আর তার যেতে চায় না। গজগজ করতে করতেই সে আবার শুরু করলো তার কাজ। আর বাড়ীর সবাই ভাবতে লাগলো, গভরু মিঞা কি করে বুঝতে পারলো যে কেউ আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছিলো।

চলতে থাকলো তার মন্ব পড়া আর সেই গামছাটা দিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে পেটানো। ঘন্টাতানিক পর তোদের দিদাকে সে বললো, “একটা বোতল ভেঙ্গে তার থেকে একটা কাঁচের টুকরো নিয়ে আসুন”। মা তাই করলেন আর ভাবতে থাকলেন কি ব্যাপার। বোঝা গেলো সেটা একটু পরেই। আমার পায়ের পাতায় তখন ইঞ্চি দুয়েক মাপের একটা কালো দাগ। গভরু মিঞা আমার শরীরের বিষটুকু নামিয়ে এনেছে ওখানে। এখন সে আমার পায়ের পাতাটা ওই কাঁচ দিয়ে চিরে বিষটুকু বের করবে। আমি তো নেতিয়েই ছিলাম। একে সাপের বিষ, তায় গামছার ক্রমাগত প্রহার। তবু নাকি একটুও কাঁদিনি। তবে চিরবে শুনেই নাকি আমি এই প্রথম চিৎকার করে কেঁদে উঠি। অবশ্য গভরু মিঞা আমার সে কাল্লাকে এতোটুকু আমল না দিয়ে তার থলে থেকে একটা সাদা রঙের পাথর বের করে বসালো আমার পায়ের ওপর। তারপর মন্ব পড়তে পড়তে চিরে দিলো আমার পায়ের পাতা ওই বোতল ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো দিয়ে। আর চালিয়ে যেতে লাগলো ওর ক্রিয়াকর্ম। সে সব অবশ্য আমার মনে নেই কিছু। তবে শুনেছি, মিনিট পনেরো পর নাকি ওই সাদা পাথরটা আস্তে আস্তে কালো হয়ে

গিয়েছিলো। আর আমার পায়ের পাতাটার সেই কালো দাগটা আর তেমন বোঝা যাচ্ছিলো না।

এই প্রথম গভরু মিঞার মুখে নাকি একটুখানি খুশির ছোঁয়া দেখেছিলো সবাই। তোদের দিদার দিকে তাকিয়ে সে বললো, “মা, আর ভয় নেই। মেয়ে তোমার বেঁচে যাবে। আমাকে এফুনি যেতে হবে, এই বিষটুকু পুড়িয়ে মাটি চাপা দিতে। তাহলে আর অন্য কোনও প্রাণীর শরীরে এ বিষ ঢুকতে পারবে না”। কথাটা বলেই সে তার জড়িবুটি আর অন্য সাজ সরঞ্জামের থলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। একটা কুটো দাতে কাটলো না সবাই হাজারো বার বলা সঙ্কেও। বললো, “আমার নিয়মে বারণ। কাজ শেষ না করে অন্য কিছু করতে পারি না আমি”।

এই সব ক্রিয়াকান্ডে এ দিকে পুরো দিনটা গেছে পেরিয়ে। বেলা চলে পড়েছে। এমন সময় বড়দা বাড়ী ফিরে এলেন। সাথে সেই সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। বাঙ্গালী ভদ্রলোক। ওখানে সবাই বলতো যে তিনি নাকি খুবই বিদগ্ধ ব্যক্তি। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সাপের বিষের ওপরে স্থানীয় ওষধির কার্যকারিতা নিয়ে। তিনি দেখলেন আমার পায়ের অবস্থা। ততক্ষণে ওই ফোন্সগুলো ফেটে ফেটে যাচ্ছিলো। সাথে পায়ের মাসলগুলো যেন গলে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। সে নাকি এক বীভৎস দৃশ্য। বাড়ীতে সবাই ভেবেছিলো যে আমার এ পা আর কোনও দিন পুরোপুরি সারবে না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হবে আমাকে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন বাড়ীতে, “আপনারা কি জানেন কি ধরণের সাপে কেটেছিলো ওকে”? অন্যরা তো কেউ

জানতো না কারণ বড়ো কেউই সাথে ছিলোনা সে সময়। ছোটোকাকু তখন বললেন যে সাপটা চন্দ্রবোড়াই হবে কারণ উনি যখন আসছিলেন আমায় দেখতে, সাপটা তখনও নাকি ট্রলি লাইনের পাশেই নিজীব ভাবে পড়ে ছিলো। ডাক্তারবাবু বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন, লক্ষণগুলো তো মিলে যাচ্ছে সবই”। তারপর তিনি তোদের দিদাকে একটা মলম জাতীয় কিছু দিয়ে বললেন, “দিনে যেন দুবার করে এটা লাগানো হয়। আর পায়ের ক্ষত কখনোও যেন ব্যান্ডেজ বাঁধা না হয়। পা টা চারদিকে কলাপাতা দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে, যতদিন না ক্ষতগুলো শুকিয়ে ওঠে”।

তারপর তো উনি চলে গেলেন। আর বললে তোরা বিশ্বাস করবিনে, তিনটে দিনও যায়নি, খোলা ক্ষতগুলো শুকিয়ে যেতে থাকলো। পায়ের চামড়া তার স্বাভাবিক রঙ ফিরে পেতে শুরু করলে। জোর ফিরে আসতে লাগলো পায়ের। আর কমাস পরই কেউ আমার পা দেখলে বুঝতেই পারতো না যে আমার ওপর দিয়ে কি ঝড় গেছে। মা তারপর বললেন, জানিস, সেই ডাক্তারবাবু যাবার আগে তোদের দিদাকে বলে গিয়েছিলেন, “একটুখানি বিষ এখনো থেকে গেছে মেয়ের শরীরে। পায়ের ব্যথা হবে মাঝে মাঝে বেশ কিছু দিন। একটা বড়ী দিচ্ছি। নিয়মিত ভাবে রোজ একটা করে দেবেন। দেবেন। কিছুদিন পর আর ব্যথা হবেনা। কিন্তু ওই সামান্য বিষটুকু শরীরে থেকে যাওয়ায় আপনার মেয়ের কখনও কোনও অসুখ বিসুখ হবে না”। তোদের দিদা তখন কথাটা কতোটুকু বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন, তা তো আমি জানিনে। তবে

তার পর এক এক করে আশিটা বছর পেরিয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে কখনও আমার কোনও অসুখ করেনি। আর আগাগোড়াই লোকে বলেছে, “ওঁর তো পাথরের মতো স্বাস্থ্য”। বলে মা থামালেন গল্প বলা। বললেন, “এই কতো সময় কেটে গেল। রাতের রান্নাটা একটু তদারকি করে আসি। যা তোরা যার যার কাজ করগে। আজকের গল্প এখানেই শেষ”।

আমি আবার নিজের মনে এটা ওটা ভাবতে শুরু করলাম, কখন জানি নিজেরই অজান্তে। ফিরে ফিরে মনে পড়ছিলো গাভরু মিঞার ছবি, যাকে আমি কোনও দিনই দেখিনি, শুধুমাত্র মার কাছে গল্পে শুনেছি। ভাবছিলুম, সে নিশ্চয়ই কিছু একটা জানতো সাপে কাটার ব্যাপারে। তার মন্ত্রতন্ত্র কতোটা আমরা বিশ্বাস করবো, সেটা আমাদের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার ওপরে নির্ভরশীল। কিন্তু আমি সেই অচেনা, অজানা লোকটির কাছে কৃতজ্ঞ কারণ সে আমার মাকে বাঁচিয়েছিল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তার জড়িবুটি, শোষণ পাথর, ঝাড়ফুঁকের নিয়ম কানুন, সব কিছুই আজ কোথায় বা হারিয়ে গেছে। এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে যদি কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য লুকিয়েও থাকতো, আজ তা বিস্মৃতির অতলে কারণ কেউ সে তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখেনি তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে।

একই কথা মনে হচ্ছিলো আমার ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধেও। উনিতো শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন নানা ধরনের। নিশ্চয়ই কোথাও তাঁর একটা কিম্বা অনেক

কটা খাতা ছিলো যাতে তাঁর পর্যবেক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করা থাকতো। পরে হয়তো তা জঞ্জাল হয়ে গিয়েছে। পুরনো খবরের কাগজের দরে কেউ বা হয়তো বিক্রি করে দিয়েছে সেইসব কাগজপত্র। আজকের এই ‘ডিজিট্যাল ডকুমেন্টেশন’ আর ‘সায়েন্টিফিক প্রোটোকল’ এর যুগে ‘এম্পিরিকেল অবজারভেশন’ এর খুব একটা দাম নেই। তবুও অনেক সময়েই এর মধ্যে অনেক দুর্লভ সত্য লুকিয়ে থাকে। আমার ফিরে ফিরে মনে হচ্ছিলো এই দুজনকে, যাঁদের একজন বাঁচিয়েছিলেন আমার মাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে, আর অন্যজন তাঁকে সুস্থ করে তুলেছিলেন আজ থেকে প্রায় আট দশক আগে দেশের এক প্রত্যন্ত প্রান্তে। দুজনের কাছেই লুকিয়ে ছিলো অনেকখানি

বিদ্যে। এই ধরনের সব হারিয়ে যাওয়া বিদ্যেগুলো যদি সঠিক ভাবে উদ্ধার করা যেতো, তাহলে অগুন্টি লোকের উপকার হতো, সঙ্গে আসতো যথেষ্ট অর্থনৈতিক সুফল।

আমার অজান্তেই শান্ত কুয়াশার ভারে আমার চোখের কোন দুটো চিক চিক করে উঠছিলো। ‘আরন্যক’ এর লবটুলিয়ার অরণ্য আর সেই আট দশক আগেকার পালংঘাটের জঙ্গল সব কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিলো। মার ছোটোবেলাকার সেই প্রত্যন্ত পৃথিবী আমার আজকের এই পরিচিত পৃথিবীর থেকে অনেক, অনেক দূরে। সে এক হারিয়ে যাওয়া অন্য পৃথিবী।



মনের সঙ্গে কথা

অর্ণব দাশগুপ্ত

দিশাহারা মন যেদিকে যখন উঁকি দাও দেখো,
সবই হাহাকার।
কাছে পাও কভু যদি কিছু তবু ভয় হয় যদি,
হারাও আবার।
সদাই পূর্ণ বাসনার ডালি মরীচিকা পিছে,
ঘুরে মরো খালি।
বারি ভাবি হয় কাছে ছুটে যাও শেষে ভুল ভাঙে,
দেখো ধু ধু বালি।
যা পেয়েছো তাই অনেক যে পাওয়া কিছু চাওয়া নয়,
পড়ে থাক বাকি।

কোন যে হিসেব পারোনি মেলাতে কেবা অকারণ,
দিয়ে গেলো ফাঁকি।
ভবসাগরের মালা ভাসিয়ে তরীখানি তার,
পালের হাওয়ায়।
আনমনে খেলে পারাপার খেলা এসো থাকি,
সেই তরীর আশায়।
আসবে যখন পারের সে তরী দারুণ তমসা,
কাটবে ধীরে।
মাঝে কটি দিন নিজেকে নিজের ভুলে থাকা,
কিছু চাওয়া পাওয়া ঘিরে।



শেষ পর্যন্ত

প্রভাত কুমার হাজারা, ম্যাসাচুসেটস

কাকার বাড়িতে থেকে কলকাতায় পড়াশুনো করি তখন। বাড়ির পশ্চিম দিকের ঘরে একটা ব্যালকনি ছিল। অনেক সময় বসে থাকতাম ওখানে। বাড়ির সামনে আর একটা বাড়ি। দু'টি বাড়ির মধ্যে ব্যবধান কেবল একটি রাস্তা। ঐ বাড়িতেও একটা ব্যালকনি ছিল। আমাদের বাড়ির ব্যালকনিতে একদিন বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম সামনের ব্যালকনিতে একজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। এক মুহূর্তে চিনতে পারলাম ওকে। বই খাতা নিয়ে ক্লাসে যাবার জন্যে ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। মনে হচ্ছিল ও এখন কলেজে পড়ে। ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছতে দেরী আছে। ওর চেহারা এমন যে একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

ওর মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। দৃষ্টি বিনিময়ের আশায় ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু কিছু লাভ হ'ল না। ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। এটা এমন কিছু নয়। তবুও ওর উপেক্ষাটা ভাল লাগলনা। পরের দিন আবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু ওর দেখা পেলামনা। এই ভাবে অনেক দিন দাঁড়িয়ে থেকেছি। ওকে দেখতেও পেয়েছি মাঝে মাঝে। কিন্তু ওর দিক থেকে কোনও পরিবর্তন হয়নি। মনে মনে ভাবলাম আমি এক সাধারণ লোক। আমার কোনও পরিচিতি নেই।

পরিচিত হতে গেলে নিজেকে প্রকাশ করতে হবে। আমি মন্ত্রী নই। দেশপ্রেমী নই। উচ্চতায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। গায়ের রঙ বড় জোর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাই চিত্রতারকা নই। মোহন বাগান ফুটবল টিমের সেন্টার ফরয়ার্ড নই।



আমার আল্পপ্রকাশ করার সব পথ বন্ধ।

আমি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে বাঙলায় অনার্স নিয়ে পাশ করেছি। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি আমার শ্রদ্ধা গভীর।

ভেবে দেখলাম ঐ পথে এগিয়ে গেলে কেমন হয়? কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম। কিছু কবিতা লেখার পরে ভেবে দেখলাম যে শুধু লেখা নয়। কবিতাগুলি প্রকাশ না করতে পারলে আমার পরিচিতি লাভের পথ বন্ধ।

কাকার বাড়ির কাছে 'উদয়ন' পত্রিকার অফিস। যে দু'কটি কবিতা লিখেছি তা নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি বললেন যে কবিতাগুলি খুব ভাল অর্থাৎ খুব আধুনিক না হলে উনি প্রকাশ করতে পারবেননা আধুনিক অর্থাৎ ভাল এ কথাটা বোঝাবার জন্যে উনি দু'কটি কবিতা আমাকে পড়তে বললেন। প্রত্যেক কবিতাই প্রকাশের জন্যে মনোযীত হয়েছে বললেন।

আমি পড়লাম। আমার মন বিষিয়ে গেল।
আমি ফিরে এলাম।

২

ওর উপেক্ষাটাকে কেন্দ্র করে
ওর উপর মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সাধারণ
লোকের তুলনায় আমার স্থান যে অনেক
উপরে তা আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ভেবে
দেখলাম একটা সুযোগ আসতে পারে। ওদের
বাড়ির পাশের বাড়িতে প্রতি বছর সরস্বতী
পূজা হয়। তখন স্থানীয় ছেলে মেয়ে নিয়ে
গান বালনা আবৃত্তি দিয়ে অকটি ছোট জলসার
ব্যবস্থা করা হয়। এ সুযোগ আমি ছেড়ে দেব
কেমন করে? আমি ঠিক করলাম ঐ দিনের
অনুষ্ঠানে আমার লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি
করব। ক্লাবের কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি চেয়ে
নিলাম।

পূজা আসতে কিছু দিন
বাকী আছে। দু'কটি যে কবিতা লিখেছি তার
মধ্যে কোন কবিতাটি পড়ব তা ঠিক করতে
পারিনা। সব শেষে ঠিক করলাম যে
কবিতাতে পৃথিবীর রূপ বর্ণনা করে লিখেছি
সেই কবিতাটি পড়ব।

ঠিক দিনে আমি
পূজামণ্ডপে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম হল ঘর
একেবারে ভর্তি। প্রতিমার সামনে যে
চেয়ারগুলি আছে সেখানে স্থান ঞ্গেই। বাধ্য
হয়ে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম।
সন্ধ্যারতি শেষ হয়েছে। এখন অনুষ্ঠানের
প্রস্তুতি চলেছে। হঠাৎ দেখলাম যার কাছে
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পাগল হয়ে

উঠেছি আর যে এখন আমার মানস কন্যা সে
সামনের সারিতে বসে আছে। অন্য কিছু না
ভেবে যে কবিতা আবৃত্তি করতে এসেছি তা
মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলাম। তিনজন
শিল্পীর গানের পরে আমার ডাক পড়ল। আমি
মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়েছি এমন সময়
হ'ল এক বিপর্যয়। লোডশেডিং হয়ে সব আলো
নিভে গেল। আমি আবৃত্তি করার যে সুযোগ
আজ পেয়েছিলাম তা চুর মার হয়ে গেল।
কলকাতায় লোডশেডিং আরম্ভ হলে শেষ হতে
চায় না। স্বেচ্ছাকর্মীরা ছোট ছুটি করে বাইরে
থেকে অনেকগুলি প্রদীপ নিয়ে এসে জ্বালিয়ে
দিল। স্বেচ্ছাকর্মীদের মধ্যে আছে আমার মানস
কন্যাও। অন্য একজন স্বেচ্ছাকর্মী আমার
মানস কন্যাকে “ তন্দ্রা ” বলে ডাকল। ওর
নাম আজ আমি প্রথম লানতে পারলাম।

৩

সেদিন রাত্রে ভেবে দেখলাম যে আমি
যা চাই তা আমাকে পেতেই হবে। আমি যখন
ওর নাম জানতে পেরেছি তখন আমার লেখা
কবিতা ওথে ডাকযোগে পাঠালে কেমন হয়?
কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? কেবল নাম
লিখে কিছু পাঠাব কি করে? কিন্তু একদিন
পথ খুলে গেল। আমাদের মেল বক্সে একদিন
একটা পোস্ট কার্ড এসে পৌঁছল। বিদেশ থেকে
কেউ পাঠিয়েছে। ঠিকানাতে লেখা আছে “
তন্দ্রা রায়। ” তারপরে রাস্তার নাম। বুঝতে
পারলাম পিওন ভুল করে আমাদের মেল বক্সে
কার্ড রেখে গেছে। আর দেবী নয়। আমার
লেখা কবিতা একটি একটি করে ওকে পাঠাতে
আরম্ভ করলাম। অবশ্য আমার নাম আর
ঠিকানা জানাতে ভুল করি না। এই ভাবে

কিছুদিন চলে গেল। ওর কাছ থেকে উত্তর পাই না। আমার নৈরাশ্য আমার কবিতা লেখার উদ্দীপনাকে গ্রাস করেছে তখন। এখন কি করতে পারি ভেবে পাইনা।

8

একদিন বসার ঘরে বসে ছিলাম। দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম একজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতরে ঢুকবার অনুমতি চায়। দরজা খুলে দিয়ে বললাম---“ ভেতরে আসুন। ” তরুণী প্রতিবাদ করে বলল---“না,না আমাকে আপনি বলবেন না।” আমি জিজ্ঞেস করলাম---“কেন?” তরুণী বলল---“ সাধারণ লোকের তুলনায় আপনার স্থান অনেক উপরে। সেই জন্যে।” আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই ধরণের কথা শুনবার জন্যে আমি এতদিন চেষ্টা করেছি। তরুণীকে বসতে বললাম। ও নিজেই বলল ওর নাম “ছন্দা।” মনে পড়ল সরস্বতী পূজার দিন ছন্দাও একজন স্বেচ্ছাকর্মী ছি’ল। ছন্দা বলল---“ সেদিন আলনার আবৃত্তি শুনবার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু লোডশেডিং হয়ে তা আর হ’লনা” আমি জিজ্ঞেস করলাম---“আমার আবৃত্তি তুমি কখনও শুনেছ?” ছন্দা বলল---“না, সে সুযোগ পাইনি। তবে আপনার লেখা সব কবিতা আমি পড়েছি।” এই কথা বলে ছন্দা টেবিলের উপর একটি একটি করে কাগজ রেখে বলল---“ এই তো আপনার লেখা সব কবিতা।” আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে এই কবিতাগুলি আমি তন্দ্রাকে পাঠিয়ে ছিলাম।

যদিও কোনও উত্তর পাইনি। ছন্দার কাছ থেকে আরও প্রশংসা শুনবার জন্যে আমার মন কাঙাল হয়ে গেছে। যে কবিতা আমি তন্দ্রাকে পাঠিয়েছি তা ছন্দার কাছে কি করে পৌঁছল সে প্রশ্ন না করে আমি জিজ্ঞেস করলাম---“ কোন কবিতাটা তোমার ভাল লেগেছে?” ছন্দা বলল “ ‘ধরণী’। ঐ কবিতাতে আপনি পৃথিবীর রূপ বর্ণনা করেছেন। তার সঙ্গে বন্দনা। ” কবিতাটি হাতে নিয়ে ছন্দা পড়তে আরম্ভ করল---

স্বর্ণ মুকুটে সাজি

পূর্ব গগন রাঙ্গি

আজি এ প্রভাতে আকাশ বুকতে

সূর্য উঠেছে জাগি

নূতন উষার আলো

নদীর বুকতে ভাল

রঙের খেলাতে মাতিয়া উঠেছে

করিতেছে ঝল মল

বাতাস বহিছে ধীরে

দূর হতে কত গন্ধ বহিয়া বুক

ঢালিয়া দিতেছে তারে

হৃদয়ের স্তরে স্তরে

শান্ত নদীর বুক

পাল তুলি দিয়া নৌকা ভাসিছে জলে

হেলিয়া দুলিয়া আপন ছন্দে

যেতেছে অজানা দেশে
রাখাল বালক বসি
বাজায় তাহার বাঁশি
হরিণ শিশুরা নয়ন মেলিয়া চাহে
দাঁড়ায়ে তাহারা আছে
আমার লেখা কবিতার একটি স্তবকের পরে
আর একটি স্তবক ছন্দা ওর ললিত কণ্ঠে
আবৃত্তি করতে লাগলো। আর আমি চোখ
বুজে শুনতে লাগলাম। সকাল থেকে আরম্ভ
করে রাত্রি পর্যন্ত পৃথিবীর রূপ বর্ণনা করেছি।
সন্ধ্যা বেলার বর্ণনায় ----

পাটের বসন পরি কণ্ঠে আঁচল টানি
আঙিনার বৃকে বধুরা আসিবে
প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে
মঙ্গল মাগি নিবে
প্রহর কাটিয়া যাবে
রাত্রি গভীর হবে
জোনাকির দল তারাদের
সাথে মিতালি করিয়া নিবে

একটুকু চুপ করে থেকে ছন্দা বলল---“
আপনি খুব রক্ষণশীল। সনাতন রীতি নীতির
উপর আপনার গভীর শ্রদ্ধা আছে।” বৃক্মতে
পারলাম ও আমার কবিতার সঠিক ব্যাখ্যাই
করেছে। ওর মন্তব্য শুনে আমার মন ভরে
গেল। ছন্দা তখনও পড়ে চলেছে---

ধন্য তুমি গো ধরনী
তুমি ওগো মোর জননী
তোমার রূপেতে হৃদয় ভরেছে
তোমার চরণে নমি
কত যুগ যুগ ধরে
আপন অক্ষ পরে
কালের বৃকেতে ছুটিয়া চলিবে
মহা ওঙ্কার রবে

জন্ম জন্ম ধরে
ফিরিব তোমার ক্রোড়ে
আবার দেখিব সূর্য উঠিবে
স্বর্ণমুকুট সাজে

আবৃত্তি শেষ হবার পরে ছন্দা বলল---“
আপনি প্রকৃতিবাদী। আপনি সত্যি সৌন্দর্যের
পূজারী। আপনি অসাধারণ। ” আমার
কৌতূহল তখনও শেষ হয়নি। আমি জিজ্ঞেস
করলাম---“ আমার লেখা কবিতা তুমি পেলে
কেমন করে?” ছন্দা বলল---“ আমার
মাসতুত বোন তন্দ্রা আমাকে দিয়েছে। আমি
যা জানতে চেয়েছিলাম তা সঠিক জানতে
পারলামনা তাই জিজ্ঞেস করলাম---
“ তোমাকে দেবার আগে ও নিশ্চয় পড়েছে।
নয় কি?” ছন্দা খিল খিল করে হেসে
বলল===” সে কি? ও বাংলার একটা অক্ষর
লিখতে বা পড়তে পারেনা। ও ক্যালকাটা

গার্লস স্কুল থেকে সিনিয়র কেমব্রিজ শেষ করে এখন লেডিব্রিবোন কলেজে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে ওর পরিচয়ই হয়নি।

এতদিন ধরে আমি যা চেয়েছিলাম তা অল্প সময়ের মধ্যে, অভাবনীয় ভাবে পেয়ে গেলাম। ছন্দা এখন ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। তবুও ও যেন কিছু বলতে চায়। একটু ইতস্ততঃ করে ও বলল---
“ আপনার কবিতাগুলো আমাকে দেবেন? আর তার সঙ্গে কিছু লিখে দেবেন? আমি বললাম-

--“নিশ্চয়ি”। কবিতার একটা পাতা হাতে নিয়ে লিখলাম---

“ধূপ আপনারে বিলাইতে চায় গন্ধে

ভাষা আপনারে মিলাইতে চায় ছন্দে”

ছন্দা খুব খুশী হ’ল। তারপর বলল---“ আপনার নাম লিখে দিন। ” আমি আমার নাম সহই করলাম---শ্রী জনার্দন চন্দ্র পাকড়নবিশ

#রবীন্দ্রনাথের “ক্যামেলিয়া” কবিতা
অবলম্বনে।



মরীচিকা

সৌমিত্র মজুমদার

কে রে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হেঁড়ে গলায় নমস্তসৈ
নমস্তসৈ করছে! মাম্ রেডিওটা বন্ধ কর
তো। একটু ঘুমোতে দেবে না এরা। যত সব।

মা রান্না ঘর থেকেই বলল আমি রেডিও
চালাইনি - তোর বাবা চালিয়েছে। কতবার
বারন করলাম, - ছেলেটা অনকে রাত করে
শুয়েছে, রেডিও চালিও না, - কে শোনে

কার কথা। গতকালেই নতুন ব্যাটারি কিনে
এনেছে।

রেডিওটা বন্ধ না হওয়াতে ছেলে নিখিল শুয়ে
শুয়েই চোঁচিয়ে বলল, ড্যাড রেডিওটা বন্ধ
কর। বাবা কাঁচুমাঁচু হয়ে বলল, একটু মহালয়া
শুনছি।

রাখতো তোমার সো কল্ড মহালয়া। অল্ ডিস্গাস্টিং, বন্ধ কর। একটু ঘুমোতে দাও। ততক্ষণে মা এসে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়েছে। আজকাল ছেলে মেয়েরা অত রাত অবধি ল্যাপটপ নিয়ে জেগে বসে থাকে, কি করে কে জানে? তেমনি সকাল দশটা - এগারোটোর আগে ওঠেনা।

আগেকার দিনে ছেলেবেলায় হারুবাবুদের বাড়ীতে রেডিও ছিল না। মহালয়ার দিন ভোরবেলায় পাশের বাড়ীতে গিয়ে রেডিওতে মহালয়া শোনার একটা আলাদাই ফ্রেজ ছিল। সে দিন আর নেই। অগত্যা টি.ভি টা মিউট করে মহিষাসুরমর্দিনী নৃত্যনাট্য দেখতে লাগল হারুবাবু।

দই এর স্বাদ কি ঘোলে মেটে? এত বছর হয়ে গেল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর মত একটা দ্বিতীয় লোক জন্মাল না? ভাবতে ভাবতে কিছুটা উদাস হয়ে গেল হারুবাবু। আবার নিজেই বিড় বিড় করে বলল হলেই বা কি হোত? কে শুনতো? এ জন্মের ছেলে ছোকরারা তো পাতেই নেবে না।

এটা বিশ্বায়নের যুগ। এখনকার যুবক-যুবতীদের চোখে বিশ্বায়নের চশমা, মহালয়া, দুর্গাপূজা এসব এদের মনে ধরে না। এদের মূলমন্ত্র ক্যারিয়ার। ইনকাম্ অ্যান্ড এঞ্জয়। ভোগ বাসনাই এদের সবকিছু। ড্র্যাডিশনাল উৎসবগুলো এখন আর তাদের কাছে উৎসব বলে মনেই হয় না - এদের শুধু পার্টি, বার্থডে, ম্যারেজ ডে, ভ্যালেন্টাইন ডে, মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, - ডে - ডে - ডে, শুধুই ডে অ্যান্ড সেলিব্রেট। এরা একুশের সন্তান।

কিন্তু হয়! কাশ, পলাশ, পদ্ম এখনও ফোটে। শিউলির সুবাস - বাতাসে বেজে ওঠা মিলনের সুর এদের মুগ্ধ করেনা। নীল আকাশে নরম তুলোর মত মেঘের আনাগোনা, দখিনা বাতাসের দোলায় পল্লবিত কিশলয়, কোকিলের কুহু কুহু রব এদের মনেপ্রাণে সাড়া জাগায় না।

দুর্গাপূজা তো কমোডিটি নয়। গ্লোবাল ভিলেজে এর মূল্য কতটুকু!

এমনি ভাবতে ভাবতে কখন সকাল হয়ে গেল বুঝতেই পারেনি হারুবাবু। সম্বিত ফিরল বৌএর হাতে এক কাপ চা এর অফার পেয়ে।

- না আজ চা খাবেনা হারুবাবু। বৌ চোখ কপালে তুলে বলল সে কি! অন্যদিন বেড়-টি না দিলে তো বাড়ীতে হলুসুলু পড়ে যেত, আজ কি হোল?

- বুঝেছি, রাগ হয়েছে, মহালয়া শুনতে না পেয়ে।

- আরে না। ওসব কি বলছো? আজ মহালয়া, ভাবছি নির্জলাই তর্পণ করব। আসছে বছর থাকি না-থাকি।

- ও এই কথা! দেখ বাপু! ডায়বিটিসের পেশেন্ট, বেশীক্ষণ খালিপেটে থেকে ভির্মি খেয়ো না। গজ গজ করতে করতে চা-টা নিয়ে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বিমলা।

হারু-বিমলার একমাত্র ছেলে নিখিল। ছোটবেলা থেকেই উভয়ের বিশেষ আদর যত্নে বেড়ে উঠেছে। ছেলেবেলায় খুব দুষ্ট এবং জেদি ছিল বটে কিন্তু পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল। যতই বড় হয়েছে বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা বেড়েছে।

বন্ধুরা অধিকাংশই বড়লোকের ছেলে। ওদের সাথে তালমিলিয়ে ছেলের সবারকম আন্ডার মেনে নিয়েছে হারুবাবু। সেই তুলনায় পড়াশুনার মান ক্রমশই কমেছে। কোনমতে গ্র্যাজুয়েশনটা সাঙ্গ করেছে। এখন কম্পিউটারের একটা কোর্স করছে বটে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বন্ধুদের সাথে আড্ডায় কাটে।

ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল হারুবাবুর কিন্তু তা না হওয়াতে বিমলাকে এজন্য দায়ী করতে সাহস পারে না হারুবাবু। মায়ের স্নেহ সর্বদা অন্ধই হয় একথা ভেবে নিজেকে সাব্বনা দেয় হারুবাবু।

রিটার্ন করার পর আগের মত ছেলের সব ডিম্যান্ড পুরো করতে পারেনা ঠিকই তবুও পে-কমিশনের এরিয়ার্স পাওয়ার পর ছেলের আন্ডার অনুযায়ী মোটর সাইকেল কিনে দিয়েছে - সে কি যে সে মোটর সাইকেল! - পেলাই একটা দৈত্য বিশেষ। অনেক সস্তা ভালো মোটর সাইকেল ছিল বাজারে। কিন্তু ছেলের এটাই চাই। এর যা দাম তাতে অন্ততঃ প্রায় দুটো মোটর সাইকেল কেনা যায়। এত দামী মোটর সাইকেল কেনায় আপত্তি ছিল হারুবাবুর - কিন্তু হারুবাবুর স্ত্রী বিমলার চোখ রাঙানীতে অগত্যা কিনতেই হল।

এবার পূজায় নতুন জামা-প্যান্ট নেবে না বলল ছেলে। জীনস্ প্যান্ট অনেক আছে। একটা প্যান্ট তো না ধুয়েই একমাস চালায় আজকালকার ছেলেমেয়েরা। কিন্তু তার পরিবর্তে ছেলের যা ডিম্যান্ড তা শুনে চোখ কপালে উঠল বিমলার। সিঙ্গাপুর যাওয়ার প্লেনের দুটো টিকিট।

ছোটবেলা থেকেই কোলকাতার পূজা দেখছি। হয়তো মুশুরীর ডাল বা এলাচ দানা বা অন্যকিছু দিয়ে। একঘেঁয়েমী। দীজ্ আর অল্ ব্যকডেটেড।

বলি দুটো টিকিট কিসের জন্য? বাবা রিটার্ন করার কারণে - তা তো ভাল করেই জানিস। বলল বিমলা।

তাতে কি হয়েছে? বাবা তো আরও বড়লোক হয়েছে। রিটার্নমেন্টে কত টাকা পেয়েছে জানো? আমার শুধু দুটো প্লেনের টিকেট চাই ব্যাস।

বলি দুটো টিকেটে কে কে যাবে? আমি আর তিতলী। মাই গার্লফ্রেন্ড। একবার সিঙ্গাপুর পৌঁছেলেই হল। কাকামনি অনেকবার বলেছে ওখানে যেতে। সেখানকার টুরটা কাকামনির দৌলতেই করা যাবে। থাকা-খাওয়ার কোন পয়সা লাগবে না। ভাবতো কত সস্তায় ট্রিপটা হয়ে যাবে। মাম্ প্লীজ বাবাকে রাজী করাতেই হবে।

তিতলীকে বিমলা চেনে। পাড়াতেই সেন বাবুদের দ্বিতীয়া কন্যা। দেখতে ভালই। ফর্সা, নাক-চোখ ভালই। কিন্তু ওদের পরিবারটা আলট্রা-মডার্ন। হালে বড় মেয়ে প্রেম করে পালিয়েছে।

সে যাই হোক, হারুবাবুকে খেতে বসার সময় ভয়ে ভয়েই কথাটা বলল বিমলা। শুনেই হারুবাবু তো রেগে আগুন। বলল এদিন দেখার জন্য এখনও বেঁচে আছি। গুণধর ছেলে বৈ তো নয়, তা প্রেমিকারও প্লেনের টিকিট কেটে দিতে হবে? - কদাপি নয়। আমি

বেঁচে থাকতে হবে না। নিজে কোনদিন ট্রেনে সেকেন্ড ক্লাস ছাড়া জানি করিনি, ব্যটা বলে কি প্লেনের টিকিট। যাবি তো যা না নিজে রোজগার করে যা। তখন যা ইচ্ছা তাই কর।

-মাথা গরম কোরনা। বার বার তো যাবে না। ছেলের সুখের জন্য একটু আধটু খরচ করলেই বা না হয়। ভগবানের কৃপায় তোমার তো সে ক্ষমতা আছে। অনুনয় বিনয় করে বলল বিমলা।

-না তা হবে না। এটাই আমার ফাইন্যাল কথা।

এর পরে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার সাহস হয়নি বিমলার।

সেদিন থেকেই নিখিল খুব উদাস হয়ে থাকে। বাড়ীতে খাওয়া-শোওয়ার ছাড়া খুব কমই বাড়ীতে থাকে। বাইরে কি করে, কোথায় যায় কেউই খুব একটা খোঁজ খবর রাখেনা। মাঝে মাঝে তিতলী কে ওর সাথে দেখা গেছে। ব্যস এ পর্যন্তই।

এদিকে পূজা এসে গেছে। এবার পূজাতে বাড়ীর কারুরই মন ভাল নেই। একমাত্র ছেলেটা কেমন যেন হাত-পা ছাড়া ভাব। কারুর সাথে কথা নেই - তাই মায়ের মনে ভরী দুঃখ। একবার কাছে ডেকে আদর করে জানতে চেয়েছে ছেলের মনের গোপন ব্যথার কথা। - কিন্তু “ছাড় তো” - বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

আজ দশমী। ঠাকুর বিসর্জন হবে। পাড়ার প্রতিমাকে সিঁদুর দিয়ে বরণ করতে গিয়েছে

বিমলা। সেখানেই ছেলেকে এক ঝলক দেখল। বন্ধুদের সাথে খোস মেজাজে আড্ডায় ব্যস্ত। বিমলা বাড়ী ফিরে এল।

রাত তখন দশটা হবে, বাড়ীতে কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে বিমলা দেখল অনেকগুলো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে একজন বলল ভাসানের সময় নিখিলদা জলে ডুবে গেছিল, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুনেই কাঁদতে শুরু করল বিমলা। চীৎকার চেচামেচি শুনে টি.ভি-টা বন্ধ করে দরজার কাছে এগিয়ে এল হারুবাবু এবং সব জানতে পারল।

পাড়ার ছেলেরা বুদ্ধি করে সঙ্গে গাড়ী নিয়ে এসেছিল। কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে হারুবাবু হাসপাতালে রওনা দিল।

তখনও জ্ঞান ফেরেনি নিখিলের। ডাক্তারদের কাছে জানতে পারল নিখিল কিছু একটা নেশা করেছে। খুব সম্ভবতঃ ড্রাগসের ডোজটা একটু বেশী হয়েছে। আর কয়েক সেকেন্ড জলের তলায় থাকলে ওখানেই ডুবে মৃত্যু হতে পারত। ভাগ্য ভাল বন্ধুরা ঠিক সময়ে জল থেকে ওকে তুলে এনেছে। জ্ঞান না আসা পর্যন্ত পেশেন্টকে আই-সি-ইউ তে থাকতে হবে। তবে ভয়ের কিছু নেই।

এদিকে খবরটা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাড়ার আবালা-বুদ্ধ-বনিতা হাসপাতালে এসে ভীড় করেছে। সকলেরই চোখে মুখে উৎকর্ষা। তিতলীকে কোথাও দেখা গেল না। খবর নিয়ে জানা গেল গতকালই তিতলী ওর কোন বয়স্কেন্ডের সাথে সিঙ্গাপুর বেড়াতে গেছে।

স্লোভেনিয়া ভ্রমণ

প্রদীপ্তা চ্যাটার্জি

গত বছর জুলাই মাসে সুযোগ এলো স্লোভেনিয়া যাবার, মানসের কনফারেন্সের আয়োজনের কিছু



কাজের জন্য। বিংহ্যামটন থেকে ইটালির ভেনিস পর্যন্ত প্লেনে, তারপরে ঘন্টা দুই লাগল ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে যেতে ছবির মতো সাজানো আর ঘন সবুজ গাছপালায় ভরা স্লোভেনিয়ার একটি ঝকমকে ছোট্ট শহরে, যার নাম হচ্ছে নোভা-গোরিকা। এই শহরটি ইটালির পাশেই, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েই কাজ ছিল মানসের। আমাদের থাকবার জায়গা হোল পার্ক হোটেলে। নোভা-গোরিকা তে আছে অজস্র কাসিনো। যত উচ্চ মানের হোটেল হবে, তত বেশি করে থাকবে সেখানে ঝলমলে আর অগুনতি জুয়াখেলার মেশিন--- এটাই এখানকার স্টাইল। হোটেলের ভিতরে ছবি তোলা বারণ ছিল, তাই ওই রঙ বেরঙের মেশিনগুলোর ছবি নেওয়া গেলনা। এছাড়া ছিল প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা সারাফুণ; এখানকার মানুষেরা দেখলাম এইসব অস্বাস্থ্যকর ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার খেয়েও যথেষ্ট ফিট এবং যাকে বলে

স্লিম। মানসের কাজ বেশ তাড়াতাড়িতেই শেষ হোল, বেশী সময় হাতে না থাকার জন্য নোভা-গোরিকার দ্রষ্টব্য গুলি আর দেখা হয়ে উঠল না, বন্ধুদের পরামর্শে আমরা পাড়ি দিলাম স্লোভেনিয়ার রাজধানী ল্যুন্নিয়ানা র উদ্দেশে---কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধানে।

ল্যুন্নিয়ানাতে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন ল্যুন্নিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। এই ভদ্রলোক মূলত ইরান প্রজাতির মানুষ; ছোটবেলাতে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ইরান থেকে এদেশে চলে আসেন, এখন অবশ্য স্লোভেনিয়ানই হয়ে গেছেন। এঁর সঙ্গে কথা বলে ও এঁরই পরামর্শ মতো পর্যটক তথ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এদেশ সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তার থেকে কিছু লেখবার চেষ্টা করলাম।

স্লোভেনিয়া এককালে ছিল ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র ইউগোস্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত; আটের দশকের শেষে যখন

ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ভাঙন সুরু হয় তখন স্লোভেনিয়া-



ই প্রথম নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, ও ইউগোস্লাভিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্লোভেনিয়ার রাজধানীর নাম ল্যুন্নিয়ানা; এই মাঝারি মাপের ইউরোপিয়ান শহরটি ভিয়েনা এবং



ভেনিসের ঠিক মাঝামাঝি, লোকসংখ্যা দুশো-আশি হাজারের মতো, আর শহরের আয়তন হচ্ছে অন্তত: একশ আশি বর্গমাইল।

লুক্সেমবার্গে বড় শহরের সুযোগসুবিধেগুলি সহজলভ্য, আবার মানুষজন ছোট-শহরের বাসিন্দাদের মত সরল প্রকৃতির ও বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন। লুক্সেমবার্গ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে ভরপুর, অথচ শহর হিসেবে খুবই আধুনিক, আর এখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা যথেষ্ট উন্নত মানের। লুক্সেমবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্য বিভিন্ন দেশের অনেক বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা এই দেশটিকে আকর্ষণীয় মনে করেন, বেশ কিছু নামকরা শিল্পীও লুক্সেমবার্গে সৃজনশীলতার সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ষাট হাজারের মত। সরকারি ভাষা ফ্লোরেন্সিয়ান হলেও অনেকেই ইংলিশ ভাষা মোটামুটি জানেন; আর কিছু মানুষ জার্মান ও ইটালিয়ানও ভালই জানেন। শহরের প্রতীক হোল লুক্সেমবার্গ ড্রাগন।

লুক্সেমবার্গে দ্রষ্টব্য স্থান অগুনতি; বহু গির্জা, মঠ,



মিনার, দুর্গ, স্মৃতি ও কীর্তিস্তম্ভের সমাবেশ এখানে। যাদুঘর, শিল্প গ্যালারি, নাট্যশালা, আর্ট গ্যালারি ও গ্রন্থাগারে ভরা এদেশ। দোকান, বাজার, কফে ও রেস্টোরাঁতে চারিদিক জমজমাট। জুলাই মাসে দেখেছিলাম চারিদিকে গাড়া সবুজ রঙের সমারোহ, আমরা হেঁটেছিলাম অনেকক্ষণ ধরে, 'ওল্ড টাউনের' পাথরের তৈরি সরু আর আঁকাবাঁকা ঢালু পথ দিয়ে, মনে হচ্ছিল যেন বহু পূর্বনো দিনে ফিরে গিয়েছি, আর এই পথ কখন যে কোথায় গিয়ে মিশবে জানা নেই। পথের বাঁকে দেখেছিলাম দাঁড়িয়ে আছে এক মধ্যযুগীয় দুর্গ, আর সেই কেলাটিকে পাহারা দিচ্ছে লুক্সেমবার্গ ড্রাগনের মূর্তি। মনে পড়ে গিয়েছিল এই শহরকে নিয়ে প্রচলিত আমাদের শোনা উপকথা।



লুক্সেমবার্গ নামটি নিয়ে আছে একটি কিংবদন্তি। জনশ্রুতি বলে, গ্রীক পুরাণের জেসন নামের এক রাজকুমার লুক্সেমবার্গের স্থাপনা করেন। এই জেসন, ইটস নামের এক রাজার কাছ থেকে ভেড়ার সোনার লোম চুরি করে, আর্গ নামক এক জাহাজে করে বন্ধুদের সঙ্গে পালাচ্ছিলেন নিজের দেশ গ্রীসে, পথে পড়েছিল ব্ল্যাক সী, ড্যানিয়ার নদী, আর লুক্সেমবার্গ নদী। জেসনের পথ আটকেছিল লুক্সেমবার্গ নদীর জলাভূমির দৈত্য বা ড্রাগন, জেসন এই দৈত্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন...এই থেকেই নাকি লুক্সেমবার্গ ড্রাগন নামটির উৎপত্তি। লুক্সেমবার্গ ড্রাগন এই শহরের

প্রতীক, সেইজন্য এখানকার দুর্গ তোরণে ল্যুরিয়ানা ড্রাগনের লোগো দেখেছিলাম।

খুব সম্ভবত: ৩৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ল্যুরিয়ানার জলাভূমিতে সুরু হয়েছিল মানুষের বসতি; যারা নদীর ধারে কাঠের বাড়ি তৈরি করে বাস করতে



আরম্ভ করে। এদের জীবিকা ছিল কৃষিকর্ম, শিকার, ও পশুপালন। ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তৈরি পোড়ামাটির স্ত্রী মূর্তি পাওয়া যায় ল্যুরিয়ানার মাটির তলায়, যেটি এখন স্লোভেনিয়ার জাতীয় মিউজিয়ামে রাখা আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখানে খুঁজে পেয়েছেন পৃথিবীর সবচাইতে পুরানো চাকার (যা তৈরি হয়েছিল ৩১০০ থেকে ৩৩৫০খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ) ভগ্নাবশেষ। এখন সেই চাকা সিটি মিউজিয়ামে রাখা আছে। ইতিহাসের প্রথম দিকে ল্যুরিয়ানার পথ ধরে বহু উপজাতির পরিচালনা প্রবাহ ছড়িয়ে পড়েছে মধ্য ইউরোপ আর ভূমধ্যসাগরের চারিপাশের দেশগুলিতে। ইতিহাস বলে ল্যুরিয়ানার পূর্বসূরি ছিল রোমান শহর ইমোনা; ১৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইমোনার স্থাপনা হয়, মাত্র পাঁচ বা ছ হাজার অধিবাসী নিয়ে। ৪৫২ খ্রিষ্টাব্দে হুন জাতির লোকেরা ইমোনা ধ্বংস করে দেয়। ছয় শতাব্দের শেষের দিকে এখানকার স্লোভেনিয়ানদের স্লাভিক পূর্বপুরুষেরা এসে পৌঁছান আর একটি মধ্যযুগীয়

শহর ধীরে ধীরে নির্মিত হয়। ল্যুরিয়ানা নামটির প্রথম লিখিত উল্লেখ দেখা যায় ১১১২ থেকে ১১২৫ সালের পুঁথিতে। তেরো শতাব্দ নাগাদ জায়গাটি শহর নামের মর্যাদা লাভ করে। ১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে বোহেমিয়ার রাজা এসে ল্যুরিয়ানার দখল করেন, এবং এর পরে বার কয়েক অন্যান্য রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয় ল্যুরিয়ানা, বিভিন্ন রাজাদের দ্বারা হাত বদলের ফলে। ১৮৯৫ শালে র ভূমিকম্পের পরে নতুন করে রেনেসাঁ স্টাইলে তৈরি করা হয় ল্যুরিয়ানাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধ ল্যুরিয়ানাকে বিশেষ ছুঁতে পারেনি। ১৯১৮ তে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পরে ল্যুরিয়ানা হয়ে দাঁড়ায় স্লোভেনিয়ার প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তিরিশ দশকের মাঝামাঝি এখানকার লোকসংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় আশি-হাজারের মতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রথমে ইটালিয়ান ও পরে জার্মান সৈন্যদল ল্যুরিয়ানাকে অধিকার করে। যার ফলে বছর তিনেক ধরে কাঁটা তারের বেড়াতে ঘেরা থাকতো এই শহর। যুদ্ধের শেষে ল্যুরিয়ানা হয় স্লোভেনিয়ার রাজধানী। তখন স্লোভেনিয়া ছিল ইউগোস্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছয়টি রিপাবলিকের একটি। ২৫শে জুন, ১৯৯১ শালে জনগণের ভোটের দ্বারা স্লোভেনিয়া স্বশাসিত ও স্বাধীন দেশ বলে ঘোষিত হয়, আর ল্যুরিয়ানা এই স্বাধীন দেশেরও রাজধানী হয়। ২০০৪ এ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় ল্যুরিয়ানা, আর ২০০৭ এ ইউরো এখানকার প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। স্লোভেনিয়ান সংস্কার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার কেন্দ্র-বর্তি ছিল ল্যুরিয়ানা সব সময়েই। ১৫৫০ সালে প্রথম প্রকাশ হয় স্লোভেনিয়ান ভাষায় লেখা দুখানি

বই। ১৫৮৪ সনে বাইবেল অনুবাদিত হয় এই ভাষায়। সতের শতাব্দীর শেষে আসে আরও অগ্রগতি, বেশ কিছু পণ্ডিতের সমন্বয় হয় এখানে, এছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আসেন বিভিন্ন শিল্পী ও স্থপতি-কলাবিদ, যার ফলে রেনেসাঁর প্রভাব কমে যায় এবং বারোক শৈলী এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭০১ সালে এখানে ফিলহারমোনিকোরামের প্রতিষ্ঠা হয় এটি ছিল ভবিষ্যৎ ফিলহারমোনিক সোসাইটির পূর্বসূরি।

লুব্লিয়ানা তার সকল সময়কালের সমৃদ্ধ ইতিহাসের কিছু কিছু প্রমাণ সম্বলে রক্ষা করতে পেরেছে। ইমানোর অবশিষ্টাংশের বহু চিহ্ন বিভিন্ন যাদুঘরে ও শহর তোরণে সুরক্ষিত। শহর কেন্দ্রে দেখা যায় রেনেসাঁ যুগের ছাপ, এবং বারোক ও ন্যু ভো শিল্প, যার কিছু উদাহরণ হোল সামঞ্জস্য বর্জিত ঢালু ছাদের বাড়ী, শহরের চিত্রিত প্রবেশ দ্বার, আর পুরনো দিনের ছাঁচে তৈরি সেতু লুব্লিয়ানিকা নদীর ওপরে। বারোক স্থাপত্যের অপূর্ব উদাহরণ দেখা যায় হোলি ট্রিনিটি চার্চ এবং আরস্যুলিন মনাস্টারির ভাস্কর্যে। সারি ট্গ অঞ্চলের বাড়িঘর মধ্যযুগীয় বারোক স্টাইলের চিহ্ন বহন করে।

নোভি ট্গে আছে জাতিয় লাইব্রেরি; ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ এর সময়কালে বিখ্যাত স্থপতিকার হোসে প্লেকনিকের দ্বারা নির্মিত আধুনিক স্টাইলে তৈরি। আধুনিক স্থাপত্যের দিকপাল জোসে প্লেকনিক তাঁর অনন্য সৃজনশীলতার সঙ্গে পুরনো দিনগুলিকে নতুন রূপ দিয়ে ইতিহাসকে জীবন্ত করে ধরে রেখেছেন দর্শকের কাছে। প্লেকনিকের স্থপতিকলা সারা লুব্লিয়ানাকে শিল্পের ছোঁয়া দিয়েছে; ট্রিপল ব্রিজ, কেন্দ্রীয় বাজারের কলোনি, লুব্লিয়ানিকা নদীর

জলকপাট, টিভলি পার্কের প্রমোদ উদ্যান, যেখানে বসন্ত কালে দেখা যায় ফুলের সজ্জার এবং শরতে রঙের বাহার, কবলারস সেতু ও জেল-কবরখানা এর নিদর্শন। লুব্লিয়ানাতে ইতিহাস ও বর্তমান মিলেমিশে আছে।

লুব্লিয়ানা শহরের মাঝামাঝি ছিল প্রাচীনতম মধ্যযুগীয় শহরটি। এখন এখানে আছে টাউন হল; এখনকার গভর্নমেন্ট বিল্ডিং, এই বাড়িটি তৈরি হয়েছিল ১৫ শতাব্দে। এই বাড়ির সামনের মাঠে রয়েছে বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্প, *Fountain of three carniolan rivers*, ইটালিয়ান ভাস্কর ফ্রান্সিস্কো রোবা এই মূর্তিগুলি তৈরি করেন ১৭৫১ শাল নাগাদ। এটি অবশ্য প্রতিক্রম। মৌলিক প্রতিকৃতিটি সাবধানে রাখা আছে ন্যাশনাল গ্যালারিতে। এর কাছাকাছিই রয়েছে ১৮২১ সালের ফিলাহারমোনিক সোসাইটির পরিচালক গুস্তাভ মাহলারের আবক্ষ শিলারূপ।

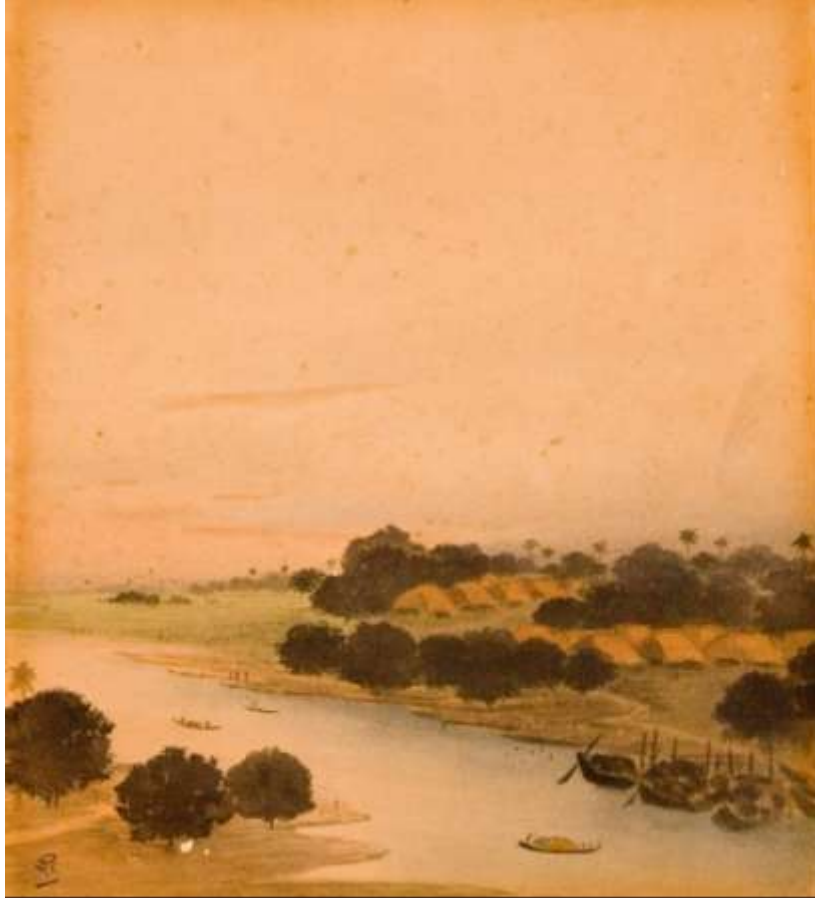
লুব্লিয়ানার বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি হয়েছিল ১৮১০ শনে, স্লোভেনিয়ার প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এখানে ৪৫০০ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতির বাস, এদের এক তৃতীয়াংশ স্থানীয় আর বাকিরা এসেছে ইউরোপের অন্যান্য দেশ, আর কিছু এসেছে অন্যান্য মহাদেশ থেকেও।

আজকের লুব্লিয়ানা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সংক্রান্ত কনভেনশন করেন এখানে, বহু বিদেশি শিল্পীদের আর্ট এগজবিশনও হয়ে থাকে। স্লোভেনিয়া বড়ই বৈচিত্র্যময় দেশ, এখানে নানা

জাতির মানুষের দেখা পাওয়া যায়। আবার পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এত ছোট এলাকার মধ্যে এতগুলি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণের জিনিস পাওয়া যাবে না। লুল্লিয়ানা থেকে খুব অল্প সময় লাগে স্লোভেনিয়ার দ্রস্টব্যস্থানগুলিতে যেতে। যেমন ঘন্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় সমুদ্র উপকূল, কি উচ্চ পর্বতমালা, কিংবা এখানকার নামকরা ভূগর্ভস্থ গুহা দেখতে।

এত বড় পৃথিবীর মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা এত

সমৃদ্ধশালী, এখানকার মানুষেরা যেন আনন্দে আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তবে এরাওতো অনেক দুঃখকষ্ট পার হয়ে এসেছে; কত রাজাদের হাতবদল হয়েছে, দুটো মহাযুদ্ধ গেছে এই দেশের ওপর দিয়ে, ভূমিকম্প এসে ধংস করে দিয়েছে সবকিছু। আবার এরা হাসিমুখে সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলেছে, আবার পুরনো ঐতিহ্যকেও যথাসম্ভব রক্ষা করে গৌরবের সঙ্গে উন্নত শিরে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে আজকের স্লোভেনিয়া।



সন্ধান

সুরমা দাশ

ভোরের বেলায় বীথিকা বনে
চলেছি আমি একা একা,
শিশির বিন্দু গাছের পাতায়
পাখির কূজন বন মাতায়
চলেছি আমি অজানা পথে
হিমের হাওয়া বইছে আকা বাকা ।
একটু একটু শিশির বিন্দু
পরছে ঝরে মাটির পরে,
ছুটো ছুটি করে বুলবুলি পাখি
করুন সুরে ডাকি ডাকি,
নীচে বসে হলুদ পাখি
তৃষ্ণা মেটায় প্রানটি ভরে ।
একটু দূরে শিরীষ ডালে
বসে পাখি আপন মনে,
তার গভীর হৃদয় হয়েছে ক্ষত
তার চোখের চাহনিতে বেদনা যত,
পাখা ঝাপটায় সে ক্ষনে ক্ষনে
আহত হয়েছে সে শিকারীর বানে ।
আমি চলেছি গহন বনে

কত স্মৃতি মনে ভেসে আসে,
হালকা হালকা ফুলের গন্ধ
পুলকিত মনে আনে ছন্দ,
অরুনোদয় পূবের আকাশে
বিকশিত ফুলের গন্ধ বাতাসে ।
চলেছি আমি সীমানা পেরিয়ে
কচি কচি ঘাসের কাপেট মাড়িয়ে,
চকিত করে হরিণ পালায়
সাদা খরগোস থমকে দাড়ায়,
কলকলিয়ে বয়ে চলে ঝর্নার জল
পারিনা যেতে আমি তা এড়িয়ে ।
মিষ্টি সুরে বাজে ঝর্নার জল
স্বচ্ছ মুক্তো যেন করছে ঝলমল,
সে যেন ডাকে আমায়
দু' হাত আমার পানে বাড়ায়,
আমার ঠোঁট করলো স্পর্শ একটু জল
তারই ছোঁয়ায় সে হোলো চঞ্চল ।
ভিজ়ে গেলো আমার লম্বা বিনুনী
গড়াতে লাগলো জল বক্ষ বেয়ে বেয়ে,

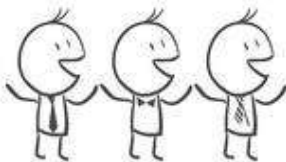
শিশু মৃগয়া দেখে আমায়
একটু ভালোবাসা পাবার আশায়,
তুলে নিলাম তাকে আমার বক্ষে
সে দেখতে লাগলো আমায় চেয়ে চেয়ে ।
তার কালো চোখের চাহনি ডাগর
সে কি হারিয়েছে পথ, সবুজ ঘাসের নেশায় !
চঞ্চল হয়েছে তার মন
কম্পিত হয়েছে তার তনু
সে যেনো কিছু বলতে চায় আমায়
সে কি হারিয়েছে মা! তাই এসেছে পায় পায় ।
ভালবেসে ফেলেছি তাকে আমি

সে যে বাঁধন ছাড়া প্রানী, তা'ও জানি,
আমার শূন্য হৃদয় মাঝে
তার ক্ষুদ্র হৃদকম্পন যে বাজে,
দু'হাতে জল ভরে তাকে দিলাম আনি
দূর হোলো আমার যত গ্লানি ।
তাকে দেখে মন আমার বিচলিত
সে যে পথ হারানো শিশু অসহায়,
সে যে খোলা হাওয়ার প্রানী
তাকে ছেড়ে যেতে হবে জানি,
তবুও মন কেন কাঁদে বেদনায়
আমি যে নিঃসন্তান, তাই কাঁদি নিরাশায় ।



My (Dream) Band

Written By: Aaditya Saha (9 years)



boys band

When you hear my boy's band play their tune,
You'll feel like you are on the moon.
With all the songs the kids will play,
You'll feel the need to stay.



And hear the magical music that flies in the air.

My band can sooth anybody - even the President

It is good for everyone, from a Prime Minister to a resident.



Once you hear the symphony play.

You will have a wonderful day.

And if you hear us for a while,

You feel like you are floating down the Nile,

It is a cure for a back that is sore.

When you hear it,

I am sure you will want more.

It is as good as the waves crashing the shore.

It is as good as a person with a good core.

It is as good as the moon in the night.

It is as good as the sun so bright.

And when it's all over

You will start to cry.

You will start to sigh.

You will feel mad.

You will feel sad.

And just wish that it went on and on.



Bangladesh and the Civil War of 1971: A firsthand account

Amalendu Chatterjee, Ph.D

Writing about a civil war is a challenge especially when it happened many decades ago. We often rely upon firsthand accounts from local people who were forced into the war intentionally or unintentionally. Today's robust social media, which thrives on instant sharing, has not always been around. . There are many complex aspects of a civil war. Here, I will highlight some of it based on my personal involvement of Bangladesh liberation movement from the beginning to the finish (March, 1971 to December, 1971). In summary, the costs of liberation were many:

- The torture and killing of 3 million people at the hands of the Pakistani military
- The creation of over 10 million refugees in India
- The rape of thousands of women and girls
- The creation of thousands of orphans
- The malnutrition of young children displaced by fighting

For readers of history, it is always interesting to understand all of the wonders of a country's birth. For the writer, it is important to present the facts as accurately as possible. Here, a historical perspective of a new country (Bangladesh) will be described. It is the account of one individual's struggle to survive, but thousands of additional perspectives exist. The official accounts of the civil war, while

helpful in conveying the overall order of events, do not always capture the day to day details that these accounts provide. It is almost equivalent to Holocaust of the second world war.

Over 90,000 soldiers and their leaders were involved but



Unfortunately, none faced the international war crime. There are over 200 countries in the world, but United Nations (UN) recognizes only 192 countries and the U.S. recognizes 194 countries. According to the 2008 World Almanac, *Montenegro and Serbia* are the newest of them. In 2011, South Sudan declared itself an independent country. It was the result of a long civil war between south and north of Sudan that lasted over six years.

In 1971 Bangladesh was experiencing a similar conflict, and a new country formed after over one year of civil disobedience and 9 months of civil war, ending 23 years of dictatorial military rule. The country had been called East Pakistan since the partition

of India in 1947 under British rule. Later, it was a province under Pakistan but thousands of miles apart, India lying in between. Pakistan had been ruled by a military dictator for many years before this civil war. There had been coup after coup by the military generals causing widespread suffering and economic problems in the country. The people of East Pakistan were diverse and spoke different languages. In addition, 40% of the population consisted of minority populations, mostly Hindus. The people of East Pakistan were, in general, educated and progressive, both socially and politically. In 1969, due to popular demand, the military ruler attempted to introduce elements of democracy. They conducted a fair election and the people of East Pakistan won a mandate to establish the infrastructure of a democratic country under its leader, Mr. Sheikh Mujibur Rahman (head of the Awami League, a political party). The military, however, did not appear ready to hand over power, and they viewed Mr. Rahman as a traitor working with India. There may be many reasons for civil war: differences in religion, race, ethnicity, or language; resistance to the oppression of a dictator; an unequal distribution of wealth; a perceived lack of representation in the national government; or a combination of the above. In the case of Bangladesh, it was a combination of language (exemplified by the 1952 Bhasha Andolan, or language movement) and racial and cultural differences that had been brewing during the years since partition. In addition, the Pakistani military seemed to promote a hatred of Hindus and of India. They tried to convince Muslims that Hindus were Indian

agents and that the long term stability of Bangladesh would be compromised if Hindus remained in Bangladesh. They spread the religious doctrine that it is the people's moral responsibility to force Hindus either to convert to Islam or to suffer forfeiture of their lands (exemplified by the Enemy Property Act).

After the 1969 election, two major political philosophies developed, because Mr. Z.A. Bhutto won in West Pakistan (representing an Urdu speaking population) and Mr. Rahman won in East Pakistan (Bengali speaking population); of note, Mr. Rahman received more votes overall, given that the Bengali speaking population was larger. Mr. Bhutto convinced the military that East Pakistanis could not be trusted and that power had to be shared. The military tried to negotiate with Mr. Rahman on a mechanism of sharing power with the West. The negotiation was widely perceived as insincere and the process took over a year and people organized civil disobedience. In the meantime, East Pakistan had become a military state by any standard, with the help of radical Muslims and an influx of over 90,000 soldiers from West Pakistan. Adamant not to hand over power, the military started a violent assault on its country's own people (Bengalis) starting on March 25, 1971. The military's first targets were intellectuals (professors, teachers, lawyers, doctors, and Hindu officials), followed by Hindus, and finally random citizens, a ploy to scare people into submission. Many Bengali regiments, unwilling to kill their own people, formed a rival group and attempted to overthrow the

West Pakistani military rulers. In the process, over 3 million people were killed and over 10 million became refugees (70% were Hindus) in India. There was complete chaos in the country because the government could not function at all during the nine months of civil war. Because financial institutions ceased to function, government and corporate employees were not paid salaries, and this economic shutdown exacerbated the problems already facing citizens.

There are many horrific survival stories from the civil war. One such story will be told here. I now live in North Carolina, but at the time I was a government engineer at Kaptai Hydro-electric dam in Chittagong Hill Tract, a district in East Pakistan. Kaptai Dam used to supply 80% of Bangladesh's electric needs. I was a young and idealistic engineer (having graduated in 1967) who feared for his safety during the civil disobedience. Luckily, Kaptai was far from the military headquarters, giving me and my colleagues some breathing room immediately following the initial military crackdown. I was very concerned for my family (who lived miles away from me) and decided to join the rival group, as did the majority of the population of East Pakistan. Instead of fighting the army in direct combat, I decided to help those who were displaced from their homes due to what had become routine atrocities committed by uniformed officers (the looting, burning, raping, and killing of innocent farmers). I left the office with one small bag, one change of clothes, a camera, and a notebook. I wanted to record all events, no matter how

seemingly insignificant. Unfortunately, half-way through my journey these items were confiscated by Muslim collaborators (called Razakars or Jamaite-Islamists) while I fled for my life one afternoon. At that time, there was no social media available for instant communication, making it difficult to spread word of the conflict. All communication was carried out by foot messengers. I lived in the jungle with one lungi (underwear) and one ganzi (undershirt) for six months while organizing local camps to feed people, offer shelter, and transport people to Indian refugee camps. We could only regroup during the night and had to disperse during the day. We could only afford one meal (one piece of bread or one cup of rice and a small amount of lentils) a day, mostly early in the morning before sunrise. We had to depend on locally grown vegetables and fruits, all uncooked, for the rest of the day. Ironically, we looted houses of Razakars and Jamaite-Islamists at night for food while they looted us during the day. Taking leadership of these camps was a risky venture, because the many young daughters, wives and elderly who had fled their homes arrived with a dangerous amount of money, gold and jewelry. Initially, these items helped feed the refugees. Unfortunately, all high-valued currencies were soon banned by the ruling military, and gold could no longer be exchanged for food. I sometimes had to post as a Christian wearing a cross around my neck, and at other times I posed as a Muslim with a long beard to avoid capture as a local rival by the military or by the Razakar. This continued over six months until India finally recognized the

Bangladeshi movement and provided material support to overthrow the corrupt military government. At this time I joined the Bangladesh government in exile (No. 8 theater road in Kolkata). To do that I had to walk over 7 to 10 days and risk being fired upon while crossing the border. I was joined by many others. It was a scene to be remembered – the cattle-like flow of people walking through rain, mud and bushes, with little more than the tattered clothes on our backs.

India finally declared war with Pakistan on the seventh of December, 1971. Bangladesh was liberated on the sixteenth of December, 1971 ending the suffering of millions. All 90,000 Pakistani soldiers surrendered to the Indian military. India was the first country to recognize Bangladesh officially, and Canada was the second country. That is how I came to Canada for my higher studies. I am now a successful entrepreneur, having retired from a career as a telecommunications engineer several years ago. The U.S. was one of the last countries to recognize Bangladesh. In fact, it was the Nixon-Kissinger policies favoring China and Pakistan that caused the initial delay in India's recognition of Bangladesh as a state, because they had placed pressure on then

Prime Minister Indira Gandhi's administration not to declare war immediately. During this time, I did not know whether my parents and relatives were alive, and I had no way of informing them of my status. For nine months, postal, telephone and telegraph services were unavailable to the general public. These resources were available only for military purposes. Words cannot express the feeling of relief I experienced when I returned to my home town in Bangladesh and found that my parents were alive. It was an emotional and happy reunion for me and my family but was not for many others. The founding father of Bangladesh was killed in 1975 by a military coup, and Bangladesh fell, again, under military rule for many years – this time by the Bengali military. Democracy has now been restored amidst intermittent violence and instability. Only time will tell whether the sacrifice of millions during the civil war will have a lasting impact and change the trajectory of the country. Bangladesh is still under cease by radicals (fundamental Muslims). Some articles of the secular and progressive constitution have been replaced with Islamic connotations and Enemy Property Act has not yet fully repealed.



Mango Dump Cake

Sudipta Chatterjee

This is an easy to make cake, just involves “dumping” the ingredients in layers and making sure the layers are evenly spread out.

Ingredients:

- 1 pack white cake mix
- 1 cup sugar (you can add a little extra if mangoes are not too sweet)
- 1 cup water
- ¼ cup oil
- 6 oz pack of mango jello (available in Indian stores)
- 3 medium ripe mangoes, diced

Take a 13x9 baking pan, spread the mangoes at the bottom of the pan. Then sprinkle the dry jello pack over the mangoes and follow



with the sugar and the dry cake mix. Now pour the oil and then the water over the dry ingredients. The cake is ready for baking.

Place the pan in a 350 degree oven and bake

for 30-40 minutes till the bottom liquid layers start bubbling and the top turns slightly brown in spots. Cool and serve.

Lau er khosa bhaja

If you buy a lau with a clean green healthy looking skin, don't throw the skin away. The khosa makes an excellent dry curry.

Ingredients:

- Lau er khosa (green part only), cut into thin strips
- Phoron: kalajeera, mustard seeds and green chilies
- Potatoes, 1“ cubes
- Bori
- Roasted jeera-lanka powder
- Posto seeds
- Sugar, salt, haldi

Fry the potatoes and bori, separately and keep aside. Then add the phoron to the oil and once the mustard seeds have spluttered, add the khosa and saute with salt and haldi. When the lau er khosa is almost done, add back the potatoes and bori. Cook for a few minutes and then add some dry posto seeds, some jeera lanka powder and sugar. The khosa bhaja is ready.



The Evolution of Durga Puja

Dilip Hari

Durga Puja - the ceremonial worship of the mother goddess is one of the most important festivals of Bengal and India. Apart from being a religious festival for the Hindus, it is also an occasion for reunion and rejuvenation, and a celebration of traditional culture and customs. While the rituals entails ten days of fast, feast and worship, the last four days - Saptami, Ashtami, Navami and Dashami - are celebrated with much gaiety and grandeur in India and abroad, especially in Bengal, where the ten-armed goddess riding the lion is worshipped with great passion and devotion.

Rama's 'Akal Bodhan'-Mythology

Durga Puja is celebrated every year in the Hindu month of Ashwin (September-October) and commemorates Lord Rama's invocation of the goddess before going to war with the demon king Ravana. This autumnal ritual was different from the conventional Durga



Puja, which is usually celebrated in the springtime. So, this Puja is also known as 'akal-bodhan' or out-of-season ('akal') worship ('bodhan'). Thus the story of Lord Rama is ceremoniously repeated, he who first worshipped

the 'Mahishasura Mardini' or the slayer of the buffalo-demon, by offering 108 blue lotuses and lighting 108 lamps, at this time of the year.

Celebration of the First Durga Puja in Bengal

The exact beginnings of the First Durga Puja celebrations are disputed. The first grand worship of Goddess Durga in recorded history is said to have been celebrated in the late 1500s. Folklores say the landlords or zamindars of Dinajpur and Malda initiated the first Durga Puja in Bengal. According to another source,

Raja Kangshanarayan of Taherpur or Bhabananda Mazumdar of Nadiya organized the first Sharadiya or Autumn Durga Puja in Bengal in 1606.

The 'Baro-Yaari' Puja and Beginning of Mass Celebration

The origin of the community puja can be credited to the twelve friends of Guptipara in Hoogly, West Bengal, who collaborated and collected contributions from local residents to conduct the first community puja called the

'baro-yaari' puja in 1790. The baro-yaari puja was brought to Kolkata in 1832 by Raja Harinath of Cossimbazar, who performed the Durga Puja at his ancestral



home in Murshidabad from 1824 to 1831. Somendra Chandra Nandy; 'Durga Puja: A Rational Approach' published in The Statesman Festival, 1991.

Origin of 'Sarbanjanin Durga Puja' or Community Celebration

"The baro-yaari puja gave way to the sarbanjanin or the community puja as we know it now, in 1910, when the Sanatan Dharmotsahini Sabha organized the first puja of this kind in Baghbazar in Kolkata with full public contribution, control and participation. Now the dominant mode of Bengali Durga Puja is the 'public' version," M. D. Muthukumaraswamy and Molly Kaushal in Folklore, Public Sphere, and Civil Society. The institution of the community Durga Puja in the 18th and the 19th century Bengal, contributed

vigorously to the development of Hindu-Bengali culture.

Evolution of the 'Pratima' and the 'Pandal'

The traditional icon of the goddess worshiped during the Durga Puja is in line with the iconography delineated in the scriptures. In Durga, the Gods bestowed their powers to co-create a beautiful goddess with ten arms, each carrying their most lethal weapon. The tableau of Durga also features her four children - Kartikeya, Ganesha, Saraswati and Lakshmi.

The huge temporary canopies - held by a framework of bamboo poles and draped with colorful fabric - that house the icons are called 'pandals'. Modern pandals are innovative, artistic and decorative at the same time, offering a visual spectacle for the numerous visitors who go 'pandal-hopping' during the four days of Durga Puja.

Durga Puja is celebrated all over India and at this time Durga Puja is celebrated by the Indian diaspora residing in different parts of the world. It is also celebrated in regions and by people that are culturally and historically distinct from India.

British Involvement in Durga Puja

The aforementioned research paper further indicates that "high level British officials regularly attended Durga Pujas organized by influential Bengalis, where British soldiers would participate in the pujas, have prasad and even salute the deity. But 'the most amazing act of worship was performed by the East India Company itself: in 1765 it offered a thanksgiving Puja, no doubt as a political act to appease its Hindu subjects, on obtaining the Diwani of Bengal'. Sukanta Chaudhuri, ed. Calcutta: the Living City, Vol. 1: The Past. It is



reported that even the Company Auditor-General John Chips organized Durga Puja at his Birbhum office. In fact, the full official participation of the British in the Durga Pujas continued till 1840, when a law was promulgated by the government banning any further participation."

Durga Puja in Delhi

In 1911, with the shift of the capital of British India to Delhi, many Bengalis migrated to the city to work in government offices. The first Durga Puja in Delhi was performed by ritually consecrating the 'mangal kalash,' which symbolized the deity. This Durga Puja, which celebrated its centennial in 2009, is also known as the Kashmere Gate Durga Puja, which is currently organized by the Delhi Durga Puja Samiti on the lawns of Bengali Senior Secondary School, Alipur Road, Delhi.



United Kingdom

Bengalis from the state of West Bengal, migrated to the UK starting in the early 1960s and contributed as doctors, engineers and skilled work force. They brought with them Ma Durga, and today Durga Puja is celebrated all over UK with much gusto and enthusiasm. From north of UK, to South there are scores of Durga Puja, and these 4/5 days makes one feel part of West Bengal. The celebration includes not only the Bengalis but many other Hindus as well. During the same period, the Gujarati community also celebrates 9 nights of Puja (Goddesses Ambe, similar to Goddesses Durga) and famous Gurba community dance, culminating in to Dashera festival.

Amongst the noteworthy Pujas in London, London Sharad Utsav Puja hosted at Ealing

Town Hall has attracted London's many Bengalis to their well organized cultural programs by renowned artists, and their impressive food arrangements.

In 2011 they organized what they called the Global Durga Puja, whereby they showed live, the Durga Pujas of Kolkata directly at their Venue, much to the amazement and excitement of the Visitors to their Puja. They also organize the Kumari Puja, which is the ritual of worshipping a small girl as Devi Durga. Another traditional Durga Puja is held in Cardiff by Wales Puja committee. They have been doing Puja for 39 years and have twice commissioned Image making in Cardiff (2002 & 2009) by the craftsmen from Burdwan & Midnapore, West Bengal making complete Durga Protima crafted in UK.

China

In 2004, a group of Indians residing in China came together and organized Durga puja in Shanghai. Since then it has become an annual affair and has got bigger with active participation from the Indian expat and the Chinese community. The idol of Ma Durga has been brought in from Kumartuli, West Bengal. Every year purohit (priest) from India is flown in to perform the puja. Elaborate decorations are done at the venue to give it a very distinct look of a pandal interior. Men, women and children turn up in traditional Indian dress at the event. Dhaks are played and Dhunuchi dances are performed. Bhog is served to all guests.

The evenings are occupied with community cultural programs and performances from visiting overseas artist. The event receives a fair bit of support from personal and corporate sponsors.

Middle East

In Muscat, Bongiyoo Parishad (Bengali Association of Muscat) celebrates Durga Puja with Bhog distribution (Astomi & Navami) and Anjali in the Shiva Temple. Vijaya sammilani (cultural programs on the event of Vijaya

Dashami/ Dussehra) is also a part of this celebration. Hundreds of Bengalis and others are found to enjoy these days here. Traditional "Dhak" is not played here; but these days, recorded beats of "Dhak" add a separate dimension to the beats of the devotees' hearts.

Nepal

Dussehra in Nepal is called Dashain. As it is chiefly a Hindu nation, the pattern and dates of the festivals coincide with those of India. The King of Nepal plays a key role in the festivities, particularly during Saptami or the Seventh day of the pujas. Despite the overthrow of the monarchy in Nepal, the Royal Family still has a significant cultural role in the nation.

United States, Canada, Europe and Australia

Durga Puja is organized by communities of Indians in the United States, Canada, Europe, and Australia. Although pandals are not constructed, the idols are flown in from Kolkata. The desire by the diaspora peoples to keep in touch with their cultural ties has led to a boom in



religious tourism, as well as learning from priests or purohits versed in the rites. In 2006, the Durga idol was immersed in the Thames river for the festival held in London and this has since developed into an annual tradition.

In the United States the pujas are often hosted during the weekends with few exceptions. The puja weekends are a time for Bengali friends and family to gather together to spend the weekend

savoring and immersing themselves in Bengali culture. Cultural programs are held; a cornucopia of Bengali food is consumed; stalls are adorned with ethnic clothes, jewelry, books and music and there is a general atmosphere of festivity and merriment.

In Canada, Durga Puja is celebrated in a number of cities, the biggest event being in Toronto Kali Bari (the only permanent Kali Temple in North America). Besides this, Durga Puja is also performed in other locations in Greater Toronto area including Etobicoke (Prabashi) and Bharat Sevasram Sangha.

In Australia, the major Durga Puja festivals are held in Sydney and Melbourne. They are also held in grand fashion in Perth, the capital of Western Australia. Bhog Distribution, Cultural Programs, anjali and dhunuchi naach are the main events. BANSW and BPCSV were the main organizers in Sydney and Melbourne respectively.

In Germany several Durga Pujas are celebrated along with Bhog distribution and Anjali in Bremen, Berlin (an over 40 years old puja), Frankfurt (Main), Hamburg, Köln (Cologne), Stuttgart and Munich (München).

South East Asia

In Malaysia and Singapore, the Malaysian Bengali Association and the Bengali Association of Singapore celebrate Durga Puja with Bhog

distribution and Anjali along with cultural programs every year.

East Africa

In conclusion, let me touch upon the celebration of Durga Puja in East Africa where I had myself lived and actively participated in the festival.

In Nairobi, Kenya Durga Puja is celebrated in a big way where I had the privilege of taking active part in organizing the puja. Originally, a few Bengali families who came to Kenya with British railway project started to perform Durga Puja in Nairobi. Later, a formal Bengali Association was launched who started celebrating the Puja in Maharashtra Mandal with the idol of Maa Durga brought from India. Every Puja day, Prasad and fest is provided and in the evenings cultural programs are held. Of late, a separate group of Bengalis comprising mostly of expatriates community started another Durga Puja in a temple in Parklands area with a lot of enthusiasm and fanfare.

In Kampala, the Bengali Association of Uganda (BAU) celebrates Durga Puja every year with a lot of zeal. BAU is a non-profit organization under the umbrella of Indian Association of Uganda and its mission is to promote a harmonious blend of our diverse culture and rich values.

In Dar-Es-Salam, Tanzania Bango Sangho organizes Durga Puja and every Bengali, in fact all Hindus rejoice in Puja celebrations with devotion and decisive jubilation. Bango Sangho is a 36 year old organization and a shelter for every Bengali living in Tanzania.





Greater Binghamton Bengali Association: 2013

Committees	Participating Members
<i>Finance</i>	Utpal Roychowdhury, Dilip Hari, Sambit Saha, Pranab Datta, Samir Biswas.
<i>Publicity</i>	Utpal Roychowdhury, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Ashim Datta, Parveen Paul, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Manas Chatterji.
<i>Puja Website</i>	Anju Sharma.
<i>Puja Magazine</i>	Pradipta Chatterji, Utpal Roychowdhury, Sheema Roychowdhury, Parveen Paul.
<i>Puja Ayojon</i>	Amol Banerjee (Priest), Aniruddha Banerjee, Vaswati Biswas, Damayanti Ghosh, Sheema Roychowdhury, Sanjukta Nad, Pradipta Chatterji, Anasua Datta, Anju Sharma, Abha Banerjee, Maitrayee Ganguly,
<i>Prasad & Bhog</i>	Vaswati Biswas, Subal Kumbhakar, Pradipta Chatterji, Sheema Roychowdhury, Damayanti Ghosh, Sanjukta Nad.
<i>Decoration</i>	Damayanti Ghosh, Anika Kumbhakar, Ishika Kumbhakar, Anju Sharma, Vaswati Biswas
<i>Lunch & Dinner</i>	Dilip Hari, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Ashim Datta.
<i>Pratima Transfer</i>	Sambit Saha, Subal Kumbhakar, Samir Biswas, Rabin Das.
<i>Local Artist Cultural Program</i>	Balvikaas Group, Ruby Biswas.
<i>Invited Artist Cultural Program</i>	Dilip Hari, Sambit Saha, Aniruddha Banerjee, Rabin Das.
<i>Audio Visual Setup & Stage Management</i>	Sambit Saha, Bijoy Datta, Aniruddha Banerjee, Rabin Das..
<i>Hall management</i>	Samir Biswas, Sambit Saha, Dilip Hari, Sheema Roychowdhury, Anju Sharma, Maitrayee Ganguly.
<i>Reception</i>	Utpal Roychowdhury, Samir Biswas, Sambit Saha.
<i>Cross Functional Coordination</i>	Utpal Roychowdhury, Sambit Saha, Pranab Datta, Dilip Hari, Samir Biswas, Subal Kumbhakar.
<i>Patrons</i>	Arindam Purakayastha, Manas Chatterji, Kanad & Indrani Ghosh, Subimal & Sudipta Chatterjee, Hiren & Dipali Banerjee, Sumit & Sudeshna Ray, Lopamudra & Subasit Acharaya, Raman & Shasi Daga, Natwar Pareek.

Greater Binghamton Bengali Association: 2013

Programs:

<u>Saturday, Oct 5, 2013:</u>	
8:00 AM – 12:30 PM	Puja (Pushpanjali at 12:15 PM)
12:30 PM – 1:30 PM	Prasad + Vegetarian Lunch
1:30 PM – 2:00 PM	Dashami Puja + Pushpanjali + Bisharjan
2:00 PM – 2:30 PM	Sindoor Utsab + Bijoya + Dhak
2:30 PM – 4:00 PM	Break
4:00 PM – 5:00 PM	‘Mahishasur- mardini’ Presented by Baalavikas Youth Group
5:05 PM – 5:35 PM	Sandhya Aarti
5:45 PM – 7:45 PM	Musical Potpourri by Invited Artists, Kedar Naphade, Kanika Pandey & Dibyarka Chatterjee (Hindusthani & Karnataki, Classical, Semi-Classical, Modern)
7:45 PM – 8:45 PM	Vegetarian Dinner
9:00 PM – 11:00 PM	Invited Artist, Pratibha Singh
<u>Sunday, Oct 6, 2013:</u>	
11:30 AM – 1:00 PM	Sruti-Natak, 'Sesher Kabita" by Rabindranath Tagore Direction: Ruby Biswas
1:15 PM – 2:15 PM	Non Vegetarian Lunch
2:30 PM – 3:00 PM	Local Artists Music Program Co-ordination: Ruby Biswas
3:15 PM – 4:45 PM	Invited Artists, Apratim Majumdar & Amit Chatterjee
4:50 PM – 5:00 PM	Program Conclusion



Greater Binghamton Bengali Association

invites you with your family and friends to



Durga Puja 2013



On October 5 & 6

Venue: Indian Cultural Centre,
1595 NYS Route 26, Vestal, NY 13850

An entire weekend of Indian classical, pop, bollywood, folk and devotional music and other artistic traditions from various parts of India. A very talented group of local children will also narrate the story of Goddess Durga through a play.

Mega Cultural Events



Pratibha Singh Baghel
Finalist SaReGaMaPa
2009

Saturday evening



Kanika
Pandey



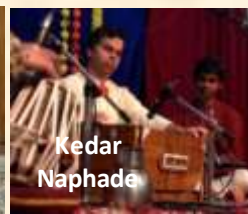
Dibyarka
Chatterjee



Baalavikas Youth Group



Apratim Wajumdar



Kedar
Naphade

[www. Binghamtonpuja.org](http://www.Binghamtonpuja.org)

ARTIST BIO: *Gopal*



Neil Sen (aka GOPAL) is a renowned contemporary Bengali artist in Houston, TX. Neil has done numerous exhibition all around the country to showcase his painting to the art lovers of Indian Origin. He has created illustrations for books & magazine covers. Gopal paints with a flurry of colors and goes into meticulous details using a broad range of styles and medium depicting the human beauty especially in its female form. He currently holds the position of Director of Arts for three institutions : Anjali Art Academy, Sugarland Artist Alliance and Kala Bhavan Art Academy.

He is presently creating numerous commissioned works for the Indian diaspora audience around the country. Please check his website at : www.redblueart.com

We greatly appreciate and acknowledge his contribution of the front and back covers for Anjali 2013.